# অপ্রমাণিত

– আছমা বেগম হাছিনা

আমার জন্ম সাউথ ওয়েলস–এর কার্ডিফ–এ। সে সূত্রে আমার বৃটিশ পাসপোর্ট, বাংলাদেশে গেলে এই পাসপোর্টের কল্যাণে আমার কাছে আসার জন্য আত্মীয়স্বজনদের মাঝে ভিড় ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এই দেশে যে আমি, সে আমি, আমার আলাদা কোনো পরিচয় নেই। এখনো কোনো ডিগ্রি লাগাতে পারিনি।

আমার আব্বা আমাদের চার ভাইবোনসহ আম্মাকে প্রতি দুই বা তিন বছর পর পর বাংলাদেশে নিয়ে যান যাতে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক না হারাই। আমাদের জেনারেশনের অনেক ছেলেমেয়েই বাংলাদেশে যেতে চায় না। কেন যেতে চায় না সেটা ভালোভাবে ব্যাখ্যাও করে না।

এ দেশে সবাই ফাস্ট জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত। এদের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। আমাদের গ্ল্যানবয় স্ট্রিটে এক কাজিন থাকেন তার নাম কাইয়ুম। তিনি মোটা কাচের চশমা ব্যবহার করেন। চোখ থেকে চশমা খুললে তিনি তার সামনে এক দুই হাতের বেশি দেখতে পান না। তার একটি অভ্যাস আছে, তিনি যখন রাস্তার পাশ দিয়ে হেটে কোথাও যান তখন চোখে চশমা পরেন না। চশমা হাতে বা পকেটে রেখে দেন। তার কথা হলো, চোখে চশমা থাকলে তিনি এদিক ওদিক তাকাবেন। কিন্তু চশমা না থাকলে রাস্তা–ঘাটে অশ্লীল কোনো দৃশ্য, মেয়েদের মিনি স্কার্ট পরার দৃশ্য, রাস্তায় দাড়িয়ে কিস করার দৃশ্য, শুধু ব্রা ও মিনি স্কার্ট পরার দৃশ্য তার চোখে পড়বে না। এ জন্য তিনি রাস্তা–ঘাটের হাটার সময় চোখে চশমা ব্যবহার করেন না।

কয়েক মাস আগের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমাদের স্ট্রিটে থাকতেন মুহিনভাই। বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের গঞ্জেহরীতে বাড়ি। আমাদের নেক্সট ডোরে থাকতো মনি, আমার বান্ধবী। তার বাড়ি মৌলভীবাজারের বরমান। মহিনভাই খুব সুন্দর করে সানগ্লাস পরতেন। লেটেস্ট মডেলের সানগ্লাস কোনোটিই তাকে মিস করতে দেখিনি।

তার সানগ্লাস পরা দেখে মনি তার প্রেমে পড়ে গেল। কিন্তু প্রস্তাব দেবে কিভাবে? কারণ আমাদের স্ট্রিটের সবাই জানে, মুহিনভাইয়ের আম্মা খুব গরম মহিলা। তার ছেলের দিকে মনি তাকিয়েছে টের পেলে অপমান করবেন। মুখে যা আসবে তা বলবেন। ফোন তিনি ধরতে পারেন। তাই ফোন করা হলো না।

শেষে মনির কথা মতো মনির জবানবন্দিতে চিঠি আমি লিখলাম। মনির যুক্তি হলো, মনির হাতের লেখা মুহিনভাইয়ের আম্মা চেনেন। কারণ মনিদের বাসায় তিনি যান। আমি চিঠি লিখে খামে ঢুকিয়ে মুহিনভাইয়ের নামে তাদের পোস্ট বক্স ফেলে দিয়ে এলাম।

দুদিন পর বিকেলবেলা মুহিনভাইয়ের আম্মা আমাদের ঘরে এলেন। শুনতে পেলাম তিনি আম্মাকে বলছেন, সেদিন পোস্ট বক্স খুলে মুহিনভাইয়ের নামে চিঠি দেখে অবাক হয়েছিলেন। কারণ মুহিনভাইয়ের নামে কখনো চিঠি আসেনি। খামে প্রেরকের ঠিকানা ছিল না। তাই তিনি কৌতূহলী হয়ে দেখলেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে, মুহিনভাই কি রকম সানগ্লাস পরলে কি রকম দেখায়, সেসব দেখে মেয়েটি প্রেমে পড়ে গেছে।

তিনি এ স্ট্রিটের সব বাঙালি ঘরে গিয়েছিলেন। কোনো মেয়ের লেখার সঙ্গে এ লেখা মেলেনি। মনি নাকি মুহিনভাইয়ের আম্মাকে বলেছে, লেখাটা হাছিনার লেখার মতো লাগছে। তাই তিনি এসেছেন চেক করতে।

আমি জানতাম, আম্মা এই দজ্জাল মহিলার সঙ্গে তর্ক করবেন না। কারণ তিনি জানেন, তর্ক করে এই মহিলার সঙ্গে পারা যাবে না। আম্মা খাতা এনে দিলেন। সব দেখে মুহিনভাইয়ের আম্মা মুখ বাকা করে বললেন, যে মেয়ে এ রকম সানগ্লাস দেখে প্রেমে পড়ে, সে আমার ছেলের বডি দেখলে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবে।

একবার ভাবলাম, বলবো আমি লিখিনি। বললাম না। কারণ আমি জানি ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবো না।

*ইংল্যান্ড থেকে*

# এডাল্ট মুভি

– সাখাওয়াৎ হোসেন রিয়াজ

ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। আত্মীয় সম্পর্কে নানা হয়। আত্মীয়ের ছেলে আমার বয়সী। সে, আমি ও আমার এক কাজিন মিলে এক রাতে এডাল্ট সিনেমা দেখবো বলে ঠিক করলাম। তখন স্টার মুভিজ–এ গভীর রাতে কিছু এক্স রেটেড সিনেমা দেখাতো। যেহেতু ভিসিআর এনে সিনেমা দেখা সম্ভব ছিল না তাই আমরা স্টার মুভিজের সিনেমা দেখবো বলে ঠিক করলাম। রাতে আমাদেরকে টিভিরুমে ফ্লোরে শুতে হবে। ফলে সিনেমা দেখতে অসুবিধা হবে না।

রাত এগারোটার পর সবাই টিভিরুম ছেড়ে যার যার রুমে চলে গেল। নানি আমাদেরকে তাড়াতাড়ি টিভি বন্ধ করে ঘুমাতে নির্দেশ করে চলে গেলেন। আরো কিছুক্ষণ টিভি দেখার পর তিনিসহ বাসার সবাই ঘুমিয়েছে নিশ্চিত হবার পর আমরা স্টার মুভিজ দেখতে শুরু করলাম। এ ধরনের সিনেমা আগে কখনো দেখিনি। তাই কিছুটা নার্ভাস বোধ করলাম।

ধীরে ধীরে সিনেমাটি অগ্রসর হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের উত্তেজনাও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সিনেমাটির নায়িকাকে জোর করে ধরে এন্টি–হিরো মিলিত হওয়া শুরু করে। যদিও কাপড়–চোপড় সব পরা ছিল তবুও এই দৃশ্য দেখে আমাদের উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌছে যায়।

এমন সময় দরজাটি ক্যাচ করে খুলে যায় এবং দরজায় নানিকে দাড়ানো দেখতে পাই। এ রকম পরিস্থিতিতে যে পড়তে পারি তা আমরা চিন্তাও করিনি। ফলে ভেবেও রাখিনি এ সময় কি করতে হবে। যেহেতু ভিসিআর–এ সিনেমাটি চলছিল না সেহেতু আমার সঙ্গী দুজন উপস্থিত বুদ্ধি বলে চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলো। দেখে যেন মনে হয় টিভি দেখতে দেখতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। এখন টিভিতে কি চলছে তার জন্য আমরা দায়ী নই। তবে সমস্যায় পড়লাম আমি।

অন্য দুজন চোখ বুজে ঘুমের ভান করতে পারে। কিন্তু আমি দুই চোখ বন্ধ করলেও আমার অন্য দুই চোখ (অর্থাৎ চশমা) তখনো খোলা থেকে যাবে। নানি এখন টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন। ওখান থেকে চোখ সরিয়ে আমাদের দিকে তাকালেই কর্ম সাবাড় হয়ে যাবে। এ দিকে আমি নড়াচড়া না করে একভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছি। নড়াচড়া করছি না। কারণ নড়লেই তিনি আমার দিকে তাকাবেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হলেই চশমা খুলে ঘুমের ভান করে থাকবো। সবাই ঘুমিয়ে আছে দেখলে তিনি নিশ্চয়ই টিভি বন্ধ করে চলে যাবেন। তবে আমি যে কোনো সুযোগই পাচ্ছি না। এদিকে ঘুরে তিনি যদি দেখেন যে, আমার চোখে চশমা রয়েছে তবে তিনি মনে করবেন, এ সিনেমা আমিই দেখছি। হায়! কি লজ্জায়ই না পড়তে হবে। শক্ত হয়ে শুয়ে আছি আর এক মনে আল্লাহকে ডাকছি।

হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, কি দেখছিস তোরা?

তখন খেয়াল করে দেখি তিনি খালি চোখে দাড়িয়ে আছেন। তার চোখে মাইনাস লেন্সের চশমাটি নেই। তিনি দূরের জিনিস এখন দেখতে পাচ্ছেন না। তাই চোখ কুচকে বার বার দেখার চেষ্টা করছেন টিভি থেকে আসা ছবিগুলো। তিনি হয়তো ঘুমিয়েছিলেন। বাথরুমে যাবেন বলে উঠেছেন। এর মধ্যে এ ঘর থেকে আওয়াজ তার কানে গিয়েছে বলে হয়তো তিনি দেখতে এসেছেন ব্যাপারটা কি। যেটাই কারণ হোক না কেন, তিনি চশমা পরে ছিলেন না।

তার এই প্রশ্নে আমার ঘুমন্ত সঙ্গী দুজন চোখ পিটপিট করে তাকে দেখতে লাগলো।

আমাদের মধ্যে সবার আগে সামলে নিল তার ছেলে। সে বললো, একটা অ্যাকশন মুভি দেখছি। একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে।

বেশি দেরি করিস না, বেশি রাত জাগার দরকার নেই ইত্যাদি উপদেশ বাণী খয়রাত করে তিনি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আমরা টিভি বন্ধ করে হাপ ছেড়ে বাচলাম।

*দৌলতপুর, খুলনা থেকে*

# ঝালাই

– সাইয়েদ মাসুম

লিখতে লিখতে যেমন কালি শেষ হয় তেমনি দেখতে দেখতেও একদিন চোখের জ্যোতি কমে যায়। চোখ নিয়ে ধারণাটা এক সময় এ রকমই ছিল আমার। তাই চশমা পরা কাউকে দেখলে খুব বিদ্বান মনে করতাম। সে বয়সী হোক আর কম বয়সী হোক। চশমা পরা কোনো ছাত্রকে দেখলে তো কোনো কথাই নেই। খুব হিংসা হতো মনে মনে।

একদিন আমারও নাকের ওপর চশমা উঠলো। সেদিনই সব ভুল ভাঙলো। আমার প্রথম চশমা নেয়ার ঘটনা বেশ মজার।

১৯৯৩ সালের কথা। তখন সবে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছি। ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। এক বন্ধে হস্টেল থেকে বাসায় চলে এলাম। বাসার পাশেই একটা ওয়ার্কশপ ছিল। ওখানে কাজ করতো আমারই সমবয়সী এক কর্মচারী, নাম হাসু। সমান বয়সী হওয়ার কারণে তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব ছিল। সুযোগ পেলেই দোকানে বসে তার কাজ দেখতাম। বড় বড় যন্ত্রপাতি আর লোহা–লক্কড় দিয়ে তার কাজ করা আমার ভালোই লাগতো। তাছাড়া তার হাতযশ ছিল। তাই দোকানে ভিড় লেগেই থাকতো।

আমি তার সঙ্গে তুলনা করে কখনোই নিজেকে বড় ভাবতে পারতাম না। তখন পর্যন্ত আমার কোনো দক্ষতা অর্জিত হয়নি শুধু মুখস্থ কিছু বিদ্যা ছাড়া। তাকে মাঝে মধ্যে বলতাম কথাটা।

উত্তরে মৃদু হেসে সে বলতো, তোমার মতো কলেজে পড়তে পারলে আমি জীবনকে ধন্য মনে করতাম।

যাহোক, সে অন্য কথা। একদিন মাথায় চাপলো ঝালাইয়ের কাজ শিখবো।

সে শুধু হাসলো! মুখে কিছু না বলে নতুন একটা স্পার্ক রড লাগিয়ে ঝালাই করার যন্ত্রটা আমার হাতে দিল।

না, কিছুতেই হচ্ছে না। বার বার লোহার সঙ্গে লেগে যাচ্ছে।

হাতলটা যখন সে নিজে ধরছে তখন কেমন সাই সাই করে গলে যাচ্ছে।

এভাবে ঝালাইয়ের চর্চা চললো দুই তিন দিন। এদিকে আমার চোখের অবস্থা যা–তা। ঝালাই মেশিনের আলোর প্রভাবে চোখ লাল হয়ে গেছে। ঠিকমতো তাকাতেই পারি না। আব্বা–আম্মা দেখে আৎকে উঠলেন। চোখ বলে কথা! তাই দেরি করা যায় না। তাগিদ দিলেন ডাক্তার দেখাতে। ঝালাই শেখার ব্যাপারটা তাদের জানা ছিল না। আমিও বললাম না ভয়ে।

আমাকে যেতে হলো ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মন্দ নন। জেলা শহরের বেশ নামকরা ডাক্তার। তিনি দেখলেন। ওষুধপত্র কিছুই লিখলেন না। শুধু চশমা ধরিয়ে দিলেন।

সুযোগটা হাতছাড়া করা যায় না ভেবে বেছে বেছে সুন্দর একটা ফ্রেম নিলাম। কার্বনের খয়েরি রঙয়ের ফ্রেমের বেশ চল ছিল তখন।

আমার নাকে চশমা উঠলো। ডাক্তার দিয়েছেন বলে বন্ধুদের টিকা টিপ্পনি নেই। আমি বহাল তবিয়তে নাকে চশমা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ক্লাসে যাই, নিজেকে কিছু একটা ভাবি।

সেই থেকে চশমা পরে পরে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন বরং চশমা ছাড়াই অসুবিধা হয়। তবে একটা বদঅভ্যাস আছে চশমা হারানোর। এ পর্যন্ত ছয় জোড়া হারিয়েছি। এখন অবশ্য চশমা কিছুটা বিরক্তিই ধরে গেছে। তাই বেশ কিছু দিন থেকে তেমন একটা পরা হয় না। তবে প্রথম চশমা নেয়ার ঘটনাটি মনে হলে এখনো হাসি পায়।

*সাভার, ঢাকা থেকে*

# এক চোখা

– ইকবাল আহমেদ চৌধুরী ইকু

২০০২ সালের এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে নিজেকে কিছুটা হালকা মনে করলাম। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, চট্টগ্রাম থেকে ঘুরে আসি। যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। জামা–কাপড় গুছিয়ে নিলাম। ব্যাগের এক পাশে চশমাটাও নিলাম। আমার ভ্রমণের বাহন হিসেবে ট্রেনকেই বেছে নিলাম। কারণ কখনো দীর্ঘ পথ ভ্রমণ হয়নি।

অবশেষে ফেনী রেলস্টেশনে গিয়ে টিকেট কাটলাম এবং কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। যথাসময়ে ট্রেন এলো। আমি কামরায় আরোহণ করলাম। ভাগ্য ছিল প্রসন্ন। ট্রেনে একটা সিট পেলাম, সাধারণত ট্রেনের সিটগুলো মুখোমুখি। তাই যাত্রীরা একজন অন্যজনকে দেখতে পায়।

টিকেট কাউন্টারে আমার কাধ থেকে ব্যাগটা নিচে পড়ে গিয়েছিল। ফলে চাপ লেগে আমার চশমার একটা স্ক্রু খুলে গিয়েছিল আমার ধারণা। তাই চশমাটা না দেখে পকেটে নিলাম।

আমার বিপরীত সিটে দুটি সুন্দরী ললনা বসে আছে। ট্রেন ছেড়েছিল খুব দ্রুতগতিতে। তাই ধুলাবালি উড়তে আরম্ভ করলো। ভাবলাম পকেট থেকে চশমাটা চোখে লাগাই। অবশেষে চশমাটা চোখে লাগালাম। ট্রেনের ভেতর প্রচণ্ড ভিড়। তাই সবাই সবার জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত।

চশমাটা লাগানোর পর ললনা দুটির চোখ আমার চোখের ওপর পড়লো। ব্যস্ততার কারণে তারা আমায় দেখে তেমন কিছু অনুভব করতে পারেনি।

একটু পর অনেক কৌতূহল নিয়ে একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। পরবর্তীকালে তার সঙ্গের মেয়েটি তার মুখ এবং তার কানে কি যেন বলা হলো। এরপর দুটো মেয়ে মিটমিট করে হাসতে আরম্ভ করলো।

তাই আমি কিছুটা বিব্রত হলাম। আবার ভাবলাম সবার তো ব্যক্তিগত কিছু না কিছু ব্যাপার–স্যাপার আছে। তাই হয়তো তারা হাসছে। মাঝে মধ্যে প্যান্টের পকেটে হাত রাখি, কি যেন মনে হয় শক্ত কিছু আছে। ধারণা হলো পয়সা ছাড়া আর কি!

হঠাৎ করে আমার বাম দিকে ব্যথা অনুভব করলাম। চোখের চশমা সরাতে গিয়ে সরাসরি আমার একটা আঙুল চোখে গিয়ে লাগে। তাই চকিত হয়ে আবার হাত দিলাম। এরপর চশমাটা খুলে দেখি, আমার বাম চোখের চশমার গ্লাসটা নেই। অর্থাৎ আমি গত সময়টাতে এক চোখে চশমা পরে আছি।

মেয়েগুলো এখন একটু শব্দ, তার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি করে হাসছে।

অনেক ব্যক্তি আমার এই হতবাক অবস্থায় হাসি বন্ধ রাখতে পারেনি।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ভাবতে লাগলাম গ্লাসটা গেল কই! হঠাৎ মনে হলো, তাহলে কি চশমার বাকি অংশটুকু আমার পকেটে! সেখান থেকে উঠে গিয়ে খাবার ক্যাবিনে চশমার গ্লাসটা ফ্রেমের ভেতর লাগিয়ে নিলাম। ততোক্ষণে আমার যাত্রাপথ শেষ হয়ে গেল। আমি চট্টগ্রাম এসে পৌছালাম।

ট্রেন থেকে নামার পর মেয়ে দুটি এক গাল লাস্যময়ী হাসি দিয়ে বললো, গ্লাসটা কোথা থেকে আমদানি করা হয়েছে মিস্টার। এতোক্ষণ তো ছিল না।

*আমি না মানে ইয়ে* বলে তাদের পাশ কেটে চলে গেলাম।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম জীবনে সব কিছু করার সময় দেখে–শুনে করবো।

*ফুলগাজি, ফেনী থেকে*

# ভুল

ছোটবেলায় আমার দুটো ভুল ধারণা ছিল। তার একটা হলো যারা শিক্ষক তারা সিগারেট খায় না এবং যারা চশমা পরে তারা সবাই ক্লাসে প্রথম হয়। দুটো ভুল ধারণাই ভাঙলো।

একদিন শিক্ষকের কাছে পড়ছি। তিনি বললেন, যা তোর বাবার সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে আয়।

তখন আমি হা। কারণ সেই প্রথম আমি জানলাম শিক্ষকরা সিগারেট খায়।

দ্বিতীয়টা ভাঙলো দূরের জিনিস আমি যখন ঝাপসা দেখতে লাগলাম তখন ডাক্তার আমাকে চশমা ব্যবহার করতে দিলেন। আমি ক্লাসে প্রথম হই না। তাই আমার চোখে চশমা আমাকে অবাক করলো।

তার দুই বছর পর আরেক চশমা পরা জ্ঞানীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটলো। পরিচয়ের কিছু দিন পর আমার হৃদয় থেকে তার জন্য তীব্র টান অনুভব করলাম। তার চশমা পরা চোখের ভেতর দিয়ে আমার দিকে যখন তাকাতো তখন আমার মনে হতো –

*প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস,*
*তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।*

দুজনের চোখেই চশমা। তাই যখন চোখে চোখ পড়তো তখন চার চোখের মিলন না ঘটে আট চোখের মিলন ঘটতো। আমার হৃদয়ের ব্যাকুলতা মুখে প্রকাশ করতে পারতাম না। চোখের ভাষায় যা প্রকাশ করতে চাইতাম তা চশমার কারণেই হোক আর অন্য কোনো কারণেই হোক সে বুঝতো না।

আমার চশমার পাওয়ার খুব বেশি। চশমা খুললে অল্প দূরের জিনিসও আবছা দেখতাম। মাঝে মধ্যে এমন হতো বৃষ্টি হচ্ছে, তার ভেতর আমি ছাদে উঠে তাকে দেখার জন্য দাড়িয়ে আছি। কখন তার ছাত্রী পড়ানো শেষ হবে। সে যাবে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে, আমি তাকে দেখবো। বৃষ্টির পানি পড়ে চশমার কাচে কুয়াশা মতো পড়তো। কিছুই দেখা যায় না। চশমা খুললেও কিছু দেখা যায় না। তখন আমার খুব কষ্ট হতো। আমি দাড়িয়ে দাড়িয়ে কাদতাম। বৃষ্টির পানি এবং চোখের পানি মিশে যেতো।

তারপরও প্রতিদিন দেখা, হাসি, ফোনে কথা বলার মাঝ দিয়ে তার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যা প্রেম নয় তার কাছে। আর মোটেই তা বন্ধুত্ব নয় আমার কাছে। কারণ ওই সম্পর্কের নাম বন্ধুত্ব দিয়ে বন্ধুত্বের অবমাননা করতে চাই না। তাই আমি না হয় শত্রু হয়েই থাকবো সারা জীবন। আমি এও জানি যে, কোনো সম্পর্কের মূল ভিত বন্ধুত্ব। কিন্তু যে আমাকে ছাদে উঠিয়ে আমার হাত থেকে মই কেড়ে নেয় সে আর যাই হোক, বন্ধু হতে পারে কি? কেউ যে তাকে নাচায় সে দোষও বোধ হয় আমার। এরপরও শত্রু চরিত্রের বন্ধুর শুভ কামনা করে গেছি।

এক বছর আগে তার সঙ্গে আমার রিকশা ক্রস করার সময় আমার মনে হলো সে আমাকে ভেংচি কাটলো। এটা কি আমার চোখের ভুল? নাকি আমি ঠিকই দেখলাম জানি না। কি ক্ষতি তার করেছি জানি না। তবে তার মনের বাসনা যাতে পূর্ণ হয় এ জন্য সরে গেছি। তার পথ থেকে বেছে নিয়েছি অনিশ্চিত জীবন।

অল্প বয়সে তার ওপর অভিমান করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু উপায় ছিল না কোনো। কারণ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার সময় যে তীব্র মানসিক কষ্ট আমাকে পেতে হয়েছে তা পাগল করে দিচ্ছিল আমায়। তাই পালিয়ে বাচতে এ শহর ছাড়তে বেছে নিয়েছিলাম ওই পথ। তার পথের কাটা হতে চাই না বলেই চলার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছি গলি।

তারপরও যখন সাত বছর পর নিউ মার্কেটে সে আমাকে চশমার ফাক দিয়ে আড়চোখে দেখে তখন মনে হয় এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছো তুমি? সাহসে কুলায় না। কারণ আমার বাবার পর সেই একমাত্র পুরুষ যার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ভয় পাই। আজও পারি না তার চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে। যেটুকু বা সাহসী হবো, অপমানিত হবার ভয়েও পিছিয়ে আসি।

তার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার ফোনে কথা হতো। সে তখন আমাকে বোঝাতো, তার আমার ভেতর যে বাধা তার মধ্যে চশমা একটি। কারণ দুজনেই কানা। তারপরও পৃথিবীতে একটি পুরুষের ক্ষেত্রেই বেহিসেবি ছিলাম। তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছি।

সবার উদ্দেশে বলি যে, কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য লোকের কথায় কান দেবেন না। কারণ অনেক বছর আগে আমি যে কথা বলিনি, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি ওই কথা বলেছি কি না। তখন কোনো জবাব দিইনি। তবে দুঃখিত, আমি সেই লোকটির কাছে তার সম্বন্ধে কিছুই বলিনি।

সাত বছর পর জানতে পারলাম সে আমার জন্মদিন মনে রেখেছে। তাতেই আমি অনেক খুশি। আমার চাহিদা খুব অল্প। আমার কাছে তার দুটো ছবি ছিল চশমা পরা। ওই বোধহয় তাকে পরিষ্কারভাবে দেখা খুব কাছ থেকে। আমার চোখে পৃথিবীতে চশমা পরা দুজন সুন্দর মানুষের মধ্যে একজন। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং অন্যজন সে। তাই তাদের প্রতি আমার শুভ কামনা, এই পৃথিবীতে সুখী হও তোমরা।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# নিঃসংকোচে

– মাহবুব

আপুর সঙ্গে ঢাকায় তার ননদের বাসায় বেড়াতে যাবো। কোথাও বেড়ানোর অফার পেলেই মস্তিষ্কে সারাক্ষণ একটা ভাবনা ঘুর ঘুর করে, এটা করবো ওটা করবো, ওটা পরবো না, এটা পরবো এই নিয়ে। তবে মনে মনে স্থির করলাম, অবশ্যই চশমা পরে যাবো। তাই করলাম।

নির্দিষ্ট ট্রেনে উঠে যাত্রা শুরু করলাম। সঙ্গে আপুর অতি আদরের তিন বছরের চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে নাসির। যথাসময়ে হুইসলের সংকেতে গর্জন করে ট্রেন ছাড়লো। ট্রেন দ্রুত বেগে এগিয়ে চলছে। মাঝে মধ্যে ট্রেনের জানালা দিয়ে বাতাসের সঙ্গে ধুলাবালি উড়ে আসছে। পকেট থেকে চশমাটা বের করে চোখে পরলাম। সোনালি ফ্রেমের শাদা গ্লাসযুক্ত পাওয়ার বিহীন গোল চশমা। সেদিন আমার চোখে চশমাটা কেমন যেন একটু ভিন্ন রকমের ভালো লাগছিল।

ধুলাবালি ছাড়াও চশমা পরার পেছনে আমার আরো কারণ আছে। আমার চোখের নিচের অংশে হালকা কালির ছাপ পড়েছে। আমি খুবই হ্যাংলা ছেলে। কিছুক্ষণ ভ্রমণ করার পর আমার মুখ মলিন ও ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এবং বড় বড় চোখ দুটো ছোট হয়ে কোটরের ভেতরে চলে যায়। এই সমস্যাগুলোকে আড়াল করার জন্যও চশমা ব্যবহার করি।

কিছুক্ষণ ট্রেন চলার পর ভাগ্নেটি আমার চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে নিজের চোখে পরলো। ব্যাপারটা আমার ভালো না লাগলেও মানতে বাধ্য হলাম। বাচ্চা ছেলে আপন মনে চোখে লাগাচ্ছে আবার খুলছে। চশমার ফ্রেম বড় হওয়াতে ওটা একেবারে তার নাকের ডগাতে চলে আসে। এক সময় নিচে তাকাতেই চশমাটি তার চোখ থেকে ট্রেনের করিডোরে পড়ে গেল। তুলে মুছে আবার আমার চোখেই পরলাম। চঞ্চল ভাগ্নেটি কেমন যেন চুপ হয়ে গেল।

এক সময় ট্রেন কমলাপুর স্টেশনে পৌছালে সবাই ট্রেন থেকে নেমে যার যার গন্তব্য পথে পা বাড়ালো। আমরা তিনজন আপুর ননদের বাসার সামনে দাড়িয়ে কলিং বেলে চাপ দিলে কাজের বুয়া এসে দরজা খুলে আমাদেরকে চিনতে না পেরে উচু স্বরে বললো, খালাম্মা, কারা যেন এসেছেন।

ভদ্রমহিলা দৌড়ে দরজার কাছে এসেই আপুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাবী, কেমন আছেন? তারপর আমার দিকে তাকালেন এবং মিটিমিটি হাসলেন।

মনে পড়ে গেল আমার চশমার কথা। আমার চোখে চশমা দেখেই কি বেয়াইন সাহেবা হাসছেন? তবে কি ওটা আমার চোখে বেমানান লাগছে? ইত্যকার হাজারো প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ভীষণ অস্বস্তিতে ভুগলাম। একবার ভাবলাম চশমাটা খুলেই ফেলি। আবার তারা কিছু মনে করেন কি না এই সন্দেহে লজ্জাতে আর খোলা হলো না।

সকলে এক সঙ্গে বসে খেলাম। লক্ষ্য করছি, বেয়াইন বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছেন। মনে মনে ভাবলাম ভুলই করেছি চশমাটা সঙ্গে এনে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা! পাতলা চিকন সোনালি ফ্রেমটি তখন আমার কাছে খুবই ভারী একটি বোঝার মতো মনে হচ্ছিল।

এক সময় তিনি বলেই ফেললেন, বেয়াই এটা কি?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, চশমা।

আবার জানতে চাইলেন আমার চোখে সমস্যা আছে কি না।

প্রতিউত্তরে বললাম, না। ধুলাবালি থেকে চোখকে নিরাপদ রাখতেই ওটা পরি।

বুঝতে পারলেন চশমাটা পাওয়ার বিহীন। আর কিছু বলেননি। তবে আমার মনের টেনশন দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

এর কিছু দিন পর আবার ওই বাসাতে যেতে হলো। কিন্তু এবার ওই উটকো ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে চশমা নিইনি। বেয়াইনের দিকে তাকাতেই দেখি তিনি অবিকল আমারটার মতোই সোনালি ফ্রেমের চকচকে চশমা চোখে লাগিয়ে বসে আছেন। রসিকতার স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি?

উত্তরে বললেন, ধুলাবালি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে উচ্চ স্বরে অনেকক্ষণ হাসলেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চোখ আজ খালি কেন?

তখন ঘটনাটা খুলে বলতেই তিনি জানালেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমার চোখের সুন্দর চশমাটা দেখেই তিনি চশমা কেনার প্রতি আগ্রহী হয়ে শেষে কিনেই ফেললেন।

আশ্চর্য হলাম।

সেই থেকে নিঃসংকোচে চশমা ব্যবহার করে আসছি।

*রায়পুর, নরসিংদী থেকে*

## হাসির কারণ

– আবু সায়েম খান

দীর্ঘদিনের শখ একটি চশমা কিনবো। এটি আমার জন্য জরুরি ছিল না। মনে মনে ভাবতাম, গোল্ডেন কালার ফ্রেমের চশমা পরলে পরিচিতজনদের মধ্যে আভিজাত্যের ভাব ফুটে উঠবে। কিন্তু চশমা কেনা যে আমার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার! অর্থনৈতিক দীনতার কারণে স্বপ্নটা একেবারেই উবে যাচ্ছিল।

অনেক দিন ধরে কিছু টাকা জমালাম। দাদি, নানি, মা, বাবার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিলাম। চশমা কেনার মতো টাকা হলো। ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝিতে গাজীপুরের দাতব্য চক্ষু চিকিৎসালয় Assistance for Blind Children (ABC)–তে নামে মাত্র ফি দিয়ে চোখ পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছে গেলাম।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্যা কি?

বানিয়ে বললাম, মাঝে মধ্যে মাথা ধরে। চোখে একটু কম দেখি।

রোদে ঘোরাঘুরি করো? ক্রিকেট খেলো?

সব সময় না। হঠাৎ হঠাৎ।

ডাক্তার আমাকে আর কিছু না বলে পাশে বসা এক ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, এ যুগের ছেলেমেয়েরা ভাব করার জন্য চশমা নেয় যার কোনো দরকার নেই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে বললেন, দেখতে তো চেহারা নমুনা মাশআল্লাহ ভালোই। চশমা লাগালে নায়কের মতো লাগবে।

আর কিছু না বলে পাওয়ার পরীক্ষার জন্য চোখে গ্লাস পরিয়ে দেয়ালে আটকানো বোর্ডে A, B, C, D, ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি লেখা পড়তে বললেন। ঠিক এ মুহূর্তেই আমার প্রচণ্ড হাসি পেল। ফিক করে হেসে দিলাম। ডাক্তার ধমকে উঠলেন। মুরুব্বিদের সামনে আচরণের ব্যাপারে কিছু উপদেশমূলক কথাবার্তা শুনিয়ে দিলেন। তারপর যতোবারই গ্লাস বদল করে বোর্ডের লেখা পড়তে বললেন ততোবারই শব্দ করে হাসছিলাম। সবশেষে ডাক্তার রেগে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন হাসছি। আমি কিছু না বলে দ্রুত কাজ সেরে চলে এলাম।

সেদিন ডাক্তারের কাছে হাসার কারণ না বলতে পারলেও আজ অনেক দিন পর বলছি।

একজন লোক অন্য এক চোখের রোগীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। রোগীকে গ্লাস চোখে দিয়ে বোর্ডের লেখা পড়তে বললেন ডাক্তার।

রোগী বললো, পড়তে পারি না।

ডাক্তার আরো বেশি পাওয়ারের গ্লাস দিলেন।

লোকটির একই কথা, পড়তে পারি না।

শেষে ডাক্তার সর্বোচ্চ পাওয়ারের গ্লাস দিলেন।

রোগী এবারও বললো, পড়তে পারি না।

ডাক্তার বিফল হয়ে সঙ্গের লোককে ডেকে বললেন, আমার দ্বারা এ রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নয়। আমি সবচেয়ে বেশি পাওয়ারের গ্লাস দিয়েছি। সে বলছে পড়তে পারছে না।

সঙ্গের লোকটি বললো, স্যার, কিভাবে পড়বে? সে তো পড়ালেখা জানে না। আসলে আমার চোখ পরীক্ষার সময় উক্ত অশিক্ষিত লোকটির কথা মনে পড়ছিল। আর তাতেই হাসি পাচ্ছিল।

যাক, চোখ পরীক্ষা শেষে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। পরদিন ঢাকা যাবো চশমা কিনতে। কিন্তু রাতেই ঘটলো দুর্ঘটনাটি। গ্রামে ডাকাতের উপদ্রব। সে রাতে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়িতে ডাকাত দল হানা দিল। অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রের সঙ্গে আমার কষ্ট করে জামানো টাকাগুলোও নিতে ভুল করলো না। আমার মনে হলো, ডাকাতেরা যেন শখ, স্বপ্ন, সাধ সবই লুটে নিয়ে গেল।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত অনেকগুলো বছর চলে গেল। এখনো আমার চশমা কেনা হয়নি। এখন সত্যি সত্যি আমার মাথা ব্যথা করে। চোখেও একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন চশমা নেয়ার জন্য। কিন্তু সাহস করে যেতে পারছি না চোখের ডাক্তারের কাছে বা চশমার দোকানে। জানি না কবে কিনতে পারবো প্রিয় সোনালি চশমা।

*শ্রীপুর, গাজীপুর থেকে*

# দাদু ও অর্পি

– এস ইসলাম

চশমার সঙ্গে একদিনেরও সম্পর্ক ঘটেনি এমন লোক খুজে পাওয়া খুবই দুরূহ। শখের জন্য চশমা, ফ্যাশনের জন্য চশমা, প্রয়োজনের জন্য চশমা। বৃদ্ধ বয়সে তো চশমা আর লাঠি ছাড়া অনেকের জীবনই অচল।

ছোটবেলায় দেখেছি গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নারিকেলের পাতা দিয়ে চশমা ও ঘড়ি বানিয়ে তার ভেতর শলাকা ঢুকিয়ে পরতে। আবার ঈদের সময় তো রঙিন চশমা কেনার হিড়িক পড়ে যায়। বাচ্চাদের

রঙিন প্লাস্টিকের চশমা আর ঘড়ি না কিনে দিলে তো ঈদের আনন্দই ভণ্ডুল হয়ে যায়। আবার অনেক মা আছেন তার কোলের শিশুটিকে সুন্দর দেখানোর জন্য শখ করে প্লাস্টিকের চশমা পরান। অথচ শিশুটি চশমা সম্পর্কে কিছুই বোঝে না। অর্থাৎ বুঝে হোক এবং না বুঝে হোক, সকলেই একবার হলেও চশমা পরেছেন।

অনেকের জীবনে চশমা নিয়ে নানান ঘটনা রয়েছে। তেমনি আমার জীবনেও চশমা নিয়ে দুটি ঘটনা স্মৃতি হয়ে আছে। প্রথমটি হলো বাল্যকালের কথা। শীতের সকাল। দাদু সকালের উষ্ণ রোদ্দুরে বসে পুথি পড়ছেন। আমি আর আনু পাশে খেলছি। হঠাৎ মাথায় দুষ্টামির ভূত চাপলো। আমি আনুকে বললাম, চল দাদুর সঙ্গে মজা করি। আনুও রাজি। আনু আমার বড় চাচার ছোট মেয়ে। এখন আমেরিকায় সেটলড। আমরা দুজনে গিয়ে দাদুকে অনুনয়-বিনয় করে বললাম, দাদু, তোমার চশমাটা একটু আমাকে দাও না।

দাদুর উত্তর, তুমি চশমা দিয়ে কি করবে।

তুমি একটু দা-ও-ই না।

নাতিদের আবদার, না দিয়ে কি আর উপায় আছে! দাদু চশমা ছাড়া তেমন দেখতে পান না।

দাদু চশমাটি খুলে আমার হাতে দিলেন আর বললেন, দেখিস ভাঙে না যেন।

যেই চশমাটি খুলে দাদু আমার হাতে দিলেন অমনি শুরু হলো আসল খেলা। এক পাশ দিয়ে আমি, অন্য পাশ দিয়ে আনু কাতুকুতু শুরু করে দিলেন। যখন দাদু আনুর দিকে তাকায়। তখন আমি দেই এক খোচা। আবার যখন আমার দিকে তাকায় তখন আনু দেয় এক খোচা। দাদু দুই হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু নুব্জ্য হয়ে যাওয়া বয়সে তা কি আর পারে। নিস্ফল চেষ্টা। প্রথম প্রথম দাদুও মজা পাচ্ছিলেন। যখন দেখলো আমাদের দুষ্টামির মাত্রা বেড়েই চলছে। পালানোর কোনো জো নেই। তখন বললো, দাড়াও দেখাচ্ছি মজা। হাতের কাছেই ছিল তার বেতের লাঠি। লাঠি দিয়ে দিলেন এক তাড়া। আমি চমশাটি তার দিকে ছুড়ে ফেলে ভো দৌড়। কিন্তু গিয়ে পড়লাম বাঘের সামনে। অর্থাৎ আমার বড় চাচার সামনে।

বড় চাচাকে বাড়ির সবাই বাঘের মতো ভয় পায়। আমি মাথা নিচু করে নিশ্চুপ দাড়িয়ে আছি। বললেন, কান ধরে দশবার ওঠাবসা করো।

তার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ওঠা-বসা শুরু করে দিলাম। ওদিকে আনু তার আব্বাকে দেখে দৌড়ে গিয়ে দাদুর কোলে আশ্রয় নিল। যে দাদু এতোক্ষণ মারতে চাইলো, বাবাকে দেখে সেই দাদুর কোলেই আশ্রয় নিল। দাদুও পরম স্নেহে পরম মমতায় বুকের ভেতর আগলিয়ে রাখলো।

দাদু আমার প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তার সেই চশমাটি আমার শোকেসে আজও স্মৃতি হয়ে আছে। দাদু যে আমাদের কতো ভালোবাসতেন তা হয়তো কাগজের পাতায় লিখে সব প্রকাশ করতে পারবো না। শুধু আছে অন্তরে। আজ আমরা কতো বড় হয়েছি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। কিন্তু দাদুর সেই স্মৃতি, স্নেহ মমতা, ভালোবাসা আজও ভুলতে পারি না। আনু যখন দেশে ফিরে তখন দাদুর চশমাটি দেখে দুজনে বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করি। কখনো হাসি আবার কখনো চোখের জল ফেলি। সময় বড়ই নিষ্ঠুর।

দ্বিতীয় যে স্মৃতি, যে বেদনা, যে দুঃখ, যে কষ্ট বহন করে বেড়াচ্ছি তা হলো, আমার একমাত্র মেয়ে অর্পিকে নিয়ে। অর্পি আমার হৃদয়ের স্পন্দন। আমার সব স্নেহ-ভালোবাসা, স্বপ্ন অর্পিকে ঘিরে। অর্পিকে ছাড়া আমি কিছু কল্পনা করতে পারি না। অর্পি যখন শিশু, হাটি হাটি পা পা, তখন তার প্রবল ঝোক চশমার প্রতি। কেউ যদি তাকে কোলে নিতো আর তার পরনে যদি চশমা থাকতো তাহলে আগেই দুই হাত দিয়ে চশমাটি টেনে ফেলে দিতো। তার মাসি তো তার জন্য চশমাই পরতে পারতো না। সে জন্য তার মাসি যখন কোনো শপিং মলে যেতেন তখন তার জন্য রঙিন চশমা কিনতেন।

অর্পি ছিল তার মায়ের খুব আদরের ধন। কিন্তু তিনি অর্পির মা ডাক শোনার আগেই ইহলোক ছেড়েছেন। তার রেখে যাওয়া একটি চশমা ও একটি ছবি আমার পার্সোনাল টেবিলে পরম ভালোবাসায় রেখে দিয়েছি। যখনই

মনে পড়ে তখনই ছবি আর চশমার দিকে তাকিয়ে কেদে কেদে বুক ভাসাই। আবার অর্পির কথা মনে করে চোখের পানি মুছে ফেলি।

অর্পি যতোই বড় হচ্ছে ততোই সে ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে। কোনো শূন্যতা তাকে ঘিরে ধরেছে। আমি মামণিকে দেখে শংকিত হই। আসলে কোনো বাবাই তার সন্তানকে মায়ের স্নেহের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না। কোনো বাবা যদি পৃথিবীর সকল ভালোবাসা এনে সন্তানকে দেয় তাহলেও সন্তানের মায়ের ভালোবাসা প্রাপ্তির শূন্যতা পূরণ হবে না। খালা, ফুফু, চাচি সকলের ভালোবাসা নিয়ে মায়ের শূন্যতা পূরণ করতে চায় অর্পি। কিন্তু তা পারে না।

একদিন এসে আমাকে বললো, বাবা, তুমি মায়ের ছবিটা আর মায়ের চশমাটা আমাকে দিয়ে দাও।

আমার বুকের ভেতর ছ্যাৎ করে উঠলো। আমি শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর একদিন ছবি আর চশমাটা তার টেবিলে রেখে এসে আমার ঘরে দরজা দিলাম।

*ঠিকানা বিহীন*

# প্রতারক

– নীড়

*চশমা* শব্দটি শুনলেই বয়স্ক একটা চেহারা চোখে ভেসে ওঠে। যদিও অনেকে অল্প বয়সেই চশমা পরা শুরু করে চোখের বিভিন্ন সমস্যার কারণে। আমি তখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিলাম বি.এ পরীক্ষা দেবো।

ফরম ফিল আপের তারিখ এসে পড়েছে। তাই বাধ্য হয়ে অনার্সের প্রাইভেট ক্লাস শেষ করে অতঃপর দৌড়াতে হতো ফরম ফিল আপের উদ্দেশ্যে। এভাবেই একদিন পরিচয় হয় একজনের সঙ্গে।

পরীক্ষা চলাকালে আসা–যাওয়ার পথে কথায় কথায় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অতঃপর প্রথম একদিন আমাকে একটি সানগ্লাস উপহার দেয় এবং চোখে পরতে বাধ্য করে। আমি যদিও দেখিনি আমাকে কেমন দেখাচ্ছে তবুও সে বললো স্মার্ট লাগছে, তাই তা মেনে নিলাম।

পরীক্ষা শেষ হলো। কিন্তু আর দেখা পেলাম না চশমা দেনেওয়ালার।

অতঃপর সেকেন্ড ইয়ার আরেক ব্যাচের প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমাদেরকে পড়তে বলা হলো অনার্সের একটি বিষয়। সেখানে গিয়েও পরিচয় হলো আরেকজনের সঙ্গে। প্রথমে পরিচয়, এরপর কথা, তারপর প্রাইভেটের সময় ছাড়াও অন্যত্র সময় কাটানো।

মাস ছয়েক পর সেও আমাকে একটি সানগ্লাস উপহার দিল এবং পরিয়ে দিয়ে বললো, তোমাকে অধ্যাপিকার মতো লাগছে।

আমিও কোমল হৃদয়ে ভালো লাগাকে মেনে নিলাম। কিন্তু কে জানতো, এই ক্ষণিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেই বিপত্তি ঘটবে।

একদিন আমার সেই বন্ধুও চলে গেল আমাকে ছেড়ে দূরে, বহু দূরে। কিন্তু সেই সানগ্লাসগুলো আমার ছোট্ট শোকেসে স্থান দখল করে আছে। যেমনভাবে ওই দুই প্রতারক বন্ধু আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল।

আমার প্রবাসী স্বামী আমার জন্য সানগ্লাস নিয়ে এসেছিল। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে সানগ্লাস পরি এবং সুখ অনুভব করি। ধিক্কার দিই ওইসব পুরুষদের যারা মেয়েদেরকে তাদের কথার মায়ায় আবদ্ধ করে অতঃপর দূরে চলে যায়।

*ঠিকানা বিহীন*

# ব্যবসা

– এ.এফ. কাঞ্চন বাহাদুর

১৯৮৪ সালে আমার বড় চাচা কাতার থেকে আমার জন্য একটা সানগ্লাস আনেন। আমি তখন ওয়ানে পড়ি। এ বয়সে চশমাটা আমার এতো পছন্দ হয়েছিল যে, শুধু গোসলের সময় ছাড়া সারাক্ষণ আমার চোখে থাকতো। এমনকি বাথরুম, ঘুমানো সকল সময়ই চশমাটা পরে থাকতাম। কাউকে তা ধরতেই দিতাম না। এ জন্য সমবয়সীরা আমাকে *চার চোখওয়ালা* বলে ডাকতো।

তবে চশমাটি ধরতে হলে বা চোখে দিয়ে দেখতে হলে আমাকে পচিশ পয়সা করে ভাড়া দিতে হতো। আর এ কাজটি করতাম স্কুলে। মফস্বলে ক্লাস ওয়ানের একটা ছাত্রের কাছে চমৎকার একটা সানগ্লাস আশা করা যেতো না। তাই ক্লাসের বন্ধুরা পচিশ পয়সার শর্তে আমার সানগ্লাসটি এক দুই মিনিট করে পরে শখ মেটাতো। এভাবে দুই তিন টাকা ভাড়া উঠতো। সে টাকা অবশ্য তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আইসক্রিম খেতাম। এ কাজটি দুই তিন দিন করি।

এরপর একদিন ক্লাসে সানগ্লাস পরা দেখে আমাদের নতুন স্যার বললেন, মি. কাঞ্চন, সানগ্লাস পরে মানুষ সূর্য থেকে রক্ষার জন্য। আর তুমি কি না রুমে পরে আছো? তাছাড়া এ বয়সে সানগ্লাস পরা ঠিক নয়। যখন কলেজে যাবে তখন সানগ্লাস ব্যবহার করো।

স্যারের কথায় খুব লজ্জা পাই। সেই থেকে আমার সানগ্লাসের ভূত নেমে যায়। আজও সানগ্লাস পরতে পারি না লজ্জায়। সানগ্লাস পরলে স্যারের সে কথা মনে পড়ে যায়।

চশমা দিয়ে বড় ধরনের ব্যবসাটা করি কিছু দিন আগে। আমার মা আমাকে খুব ভালোবাসেন। আমি ঢাকা থেকে বাড়ি গেলে আমার মা তার নতুন কেনা কানের দুল, নেকলেস বা হাতের রুলি কিংবা আব্বার কেনা নতুন শাড়ি দেখাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। যেটা আমার পছন্দ হয় বা সমর্থন পায় তা তিনি খুব যত্ন করে ব্যবহার করেন। অপছন্দনীয়গুলো ফেলে রাখেন।

কিছু দিন আগে বাড়ি গেলে আম্মা বললেন, দেখ তো, এবারের চশমার ফ্রেমটা ঠিক আছে কি না।

আমার নতুন একটা মোবাইল সেট কিনতে হবে। এ জন্য সামান্য কিছু টাকার প্রয়োজন। তাই সুযোগ বুঝে বলে দিই আমার একদম পছন্দ হয়নি। এখন কেউ সোনালি ফ্রেম ব্যবহার করে নাকি?

তখন আম্মা বললেন, ঠিক আছে, ঢাকা যাওয়ার সময় টাকা নিয়ে যাস।

ভালো ফ্রেমের কথা বলে দেড় হাজার টাকা নিই।

এদিকে এক মাস হয়ে গেলে আম্মা ফোন করে তাগাদা দেন।

এখন উপায়! টাকা তো মোবাইল সেটে লাগিয়েছি। এবার বুদ্ধি করলাম, আব্বার কাছ থেকে নেবো। কারণ আব্বা জানেন না আম্মা আমাকে টাকা দিয়েছেন। আব্বাকে বললাম, আম্মার ফ্রেমটা একদম পছন্দ হয় না। এক হাজার টাকা দিন, নতুন ফ্রেম কিনবো।

আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বনানী জুয়েল অপটিক থেকে এস কালারের একটা ফ্রেমের ব্যবস্থা করি যা আম্মার খুব পছন্দ হয়। এ জন্য আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি জেনেও কিছুই বলেন না। তাছাড়া সব বাবা–মাই কম বেশি জানেন তাদের সন্তানরা বিভিন্ন অজুহাতে বাড়ি থেকে টাকা নেয়।

*রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে*

# স্মার্টস্যার

– ফৌজি

আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। গণিত প্রাইভেট পড়তাম এক ব্যাচেলর শিক্ষকের কাছে। বেশ ভালো পড়াতেন। হঠাৎ একদিন দেখি স্যারের চোখে গোল্ডেন কালারের ফ্রেমের একটা চশমা। জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার, হঠাৎ চোখে চশমা দিলেন যে?

স্যারের জবাব এলো, আরে ব্যাটা, চশমা না দিলে স্মার্ট লাগে না।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। কারণ স্যারের যে চেহারা এবং নিগ্রোর মতো গায়ের রঙ তাতে চশমা দিয়ে স্মার্ট হলেই বা কি, না হলেই বা কি।

কিছু দিন পর জানা গেল, স্যার সদ্য বিয়ে করেছেন এবং তার নববিবাহিতা স্ত্রী তাকে বলেছেন যে, চশমা দেয়ার মাঝে নাকি স্মার্টনেসের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই থেকে আমাদের স্যারের নাম হয়ে গেল *স্মার্টস্যার।*

দ্বিতীয় ঘটনা কলেজে পড়াকালে। ঢাকায় কলেজে আমাদের গণিতের আরেক শিক্ষক, নাম সাহাবুদ্দীনস্যার। প্রথম ক্লাসে এলেন চোখে একটা চশমা। দেখে মনে হলো চশমার অর্ধেক কাটা। আসলে চশমাটা নাকি ও রকমের।

সে যাক। তিনি নাকের ওপরে চশমা রেখে আড়চোখে তাকাতেন এবং মাঝে মধ্যে আঙুল দিয়ে চশমা ধাক্কা দিয়ে পজিশন ঠিক করতেন। প্রতিবার চশমা ঠিক করতেন এবং বলতেন, সাবধান আমার দিকে চোখ তুলে কেউ তাকাবি না। তাহলে তোর চোখ খুলে টেবিলে রাখবো, বুঝছস।

চান্স পেলে শুনিয়ে দিতেন, আমার বাসার কাছে ঘুর ঘুর করবি না।

কারণ জানা গেল, তার ষোড়শী কন্যা আছে।

তৃতীয় ঘটনা নিজেকে নিয়ে।

জীবনে প্রথম চশমা নিতে হচ্ছে। ভাবতেই খারাপ লাগছে। যে আমি কখনো চশমা পরবো না সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শেষ পর্যন্ত তাকেই কি না চশমা নিতে হলো। যাক, চশমা কিনে বাসায় এলাম।

ঈদের দিন নামাজের পর অতিথিরা বাসায় আসা শুরু করেছে। আমার চশমাটা খুলে বেড়ে রেখেছি। আমার আদরের ছোট ভাই এসে আস্তে করে চশমার ওপর বসতেই পট করে একটা আওয়াজ শুনলাম। দৌড়ে এসে দেখি গ্লাস ভেঙে গেছে। সঙ্গে ফ্রেমটাও বাকা হয়ে গেছে। যাক, কি আর করা! নতুন চশমা নিতে গেলাম দোকানে। দাম করা শেষে এবার কিছু টাকা এডভান্স করার পালা। কিন্তু সঙ্গে টাকা আনতে ভুলে গেছি। দোকানদারের কাছে ভীষণ লজ্জায় পড়লাম। বললাম, কাল এসে টাকা দেবো।

পরের দিন টাকা দিয়ে চশমাটা নিলাম। চোখে দেয়ার পর পরই সবাই জিজ্ঞাসা করছে, চশমাটা কতো, কোন জায়গায় থেকে কিনেছি, আমাকে বেশ মানিয়েছে ইত্যাদি।

এখানে শেষ হলেই হয়তো ভালো হতো। মেডিকাল কলেজে ক্লাস করতে গিয়েছি। আমাদের সকাল নয়টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত হাসপাতালে ক্লাস করতে হয়। আমরা রোগীর সঙ্গে কথা বলি, তাদের সমস্যা কি তা জানার চেষ্টা করি, মাঝে মাঝে পরীক্ষা করি।

একদিন স্টেথোস্কোপ দিয়ে রোগী পরীক্ষা করছিলাম।

কাজ শেষ করলে রোগী আমাকে বললো, ডাক্তার সাব, কিছু মনে করবেন না। আপনার চশমাটা একটু ধরে দেখতে পারি?

আমি তো অবাক! চশমা এমন কি জিনিস তা ধরে দেখতে হবে।

চশমা খুলে দিলে রোগীটি বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেখলো। আমার অবশ্য বেশ পুলক বোধ হচ্ছিল যে, যাক, জীবনে একটা জিনিস কিনেছি।

এই চশমার ঘটনা এখানেই শেষ নয়। হঠাৎ রাস্তায় দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আমার প্রিয় চশমা ভেঙে চার টুকরো হয়ে গেল। বেশ কয়েকজন আহত। কিন্তু আমার সেদিকে খেয়াল নেই। আমি আমার চশমার ফ্রেম খুজছি। উল্লেখ্য, চশমাটি রিমলেস হওয়াতে ফ্রেমটাতে স্ক্রু খুলে আবার গ্লাস বসানো যাবে।

অবশেষে পেলাম দশ হাত দূরে আমার ভাঙা ফ্রেমের অংশ। তাই নিয়ে আবার ছুটলাম চশমার দোকানে। ভাবলাম অনেক দিন হলো, চোখের ডাক্তার দেখানো হয়নি। তাই একটু ডাক্তার দেখিয়ে চশমাটা নিই। কারণ সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাওয়ার পরিবর্তন হয়। ডা. এম.এ আরিফস্যারকে দেখালাম।

স্যার বলবেন, চশমা আর কতো পরবে। তুমি এক কাজ করো, ল্যাসিক চিকিৎসা করাও। উল্লেখ্য, ল্যাসিক হলো রশ্মির সাহায্যে চোখের পাওয়ার ঠিক করে দেয়া যাতে চশমা কিংবা কনটাক্ট লেন্স পরার প্রয়োজন হবে না।

মনে মনে ভাবলাম যদি কিছু টাকা বেশি দিয়ে ল্যাসিক করাই তাহলে আর চশমা কেনার টাকা লাগবে না। তাই স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কতো খরচ পড়বে?

স্যার বললেন, বেশি না, অল্পতেই হবে।

মনে মনে আনন্দিত হলাম, তাহলে বোধহয় চশমা আর পরা লাগবে না। পরে জানলাম ল্যাসিক করাতে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা লাগবে। ভাবলাম আমার ল্যাসিক দরকার নেই। চশমা দিয়েই আমার স্যারের মতো স্মার্ট ভাব নেয়ার চেষ্টা করি।

*টিলাগড়, সিলেট থেকে*

## ইংলিশ ম্যাডাম

– মুহম্মদ ছাদেক আলী

১৯৬০ সালের কথা। আমি তখন ঢাকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ট্রেনিংরত। এ ট্রেনিংয়ে আমার সহপাঠী ছিলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান। আমরা এক সঙ্গে কলেজে সাপ্তাহিক ও মাসিক অনুষ্ঠান করেছি। ভ্রমণে গিয়েছি, বাৎসরিক নাটক মঞ্চস্থ করেছি।

প্রতিদিন ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হতো। কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন। এ সঙ্গীত পর্যায়ক্রমে আমি ও জাহানারা ইমাম পরিচালনা করতাম।

তখন আমাদের পৃন্সিপাল ছিলেন এমও গনী। তিনি ট্রেনিংরত ছাত্রছাত্রীদের বড়ই ভালোবাসতেন। কোনো প্রকার অসুবিধা থাকলে দ্রুত সমাধান করতেন। আমাদের সঙ্গে বন্ধু সুলভ আচরণ করতেন। তার মধুর ব্যবহারে আমরা সবাই মুগ্ধ ছিলাম। তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পাশের ল্যাবরেটরি হাই স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজ একটি আদর্শ কলেজে পরিণত হয়েছিল। তিনি মনে প্রাণে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্লাসে দাড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পড়াতেন। বেত্রাঘাত করতেন না কখনো। বিকেলে বন্ধুর মতো মাঠে বসে গল্প করতেন এবং উপদেশ দিতেন। বলতেন, শিক্ষকরা হচ্ছে বাগানের মালীর মতো। মালী যেমন সেবা–যত্ন করে ছোট চারা গাছগুলোকে জল সিঞ্চন করে বড় করে তোলে, শিক্ষকও তেমনি ছাত্রদের সেবা–যত্ন করে, ভালোবেসে বড় করে তুলবেন। তার কথা এবং সে পরিবেশের কথা ভোলা যায় না।

নিয়ম অনুসারে কলেজে থিওরেটিকাল ক্লাস শেষ হলেই ঢাকার বিখ্যাত স্কুলে প্র্যাকটিকাল টিচিংয়ে যেতে হতো। কারণ ট্রেনিংয়ে থিওরির চেয়ে প্র্যাকটিকাল টিচিংয়ের মূল্য বেশি ছিল। থিওরিতে ছিল ৪০ আর প্র্যাকটিকাল টিচিংয়ে নাম্বার ছিল ৬০। প্র্যাকটিকাল টিচিংয়ে খারাপ করলে পাস করা যেতো না।

কলেজের শিক্ষকরা স্কুলে ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাসে পাঠদান পদ্ধতি দেখে তাদের নোট খাতায় নাম্বার ও উপদেশ দিতেন। প্র্যাকটিকাল টিচিংয়ে খারাপ করলে তার পাস করা কঠিন হতো। এই প্র্যাকটিকাল টিচিংয়ে ও থিওরির নাম্বারের ওপর ভিত্তি করেই বার্ষিক রেজাল্ট হতো।

তারপরও মাঝে মধ্যে ভালো স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক এনে মডেল প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা কলেজে করা হতো।

একদিন হলিক্রস স্কুল থেকে ক্লাস নাইনের ছাত্রীদের সঙ্গে একজন ম্যাডামকে এনে কলেজে মডেল প্র্যাকটিস টিচিংয়ের ব্যবস্থা করা হলো যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে–কলমে শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি বুঝতে পারে।

ক্লাস নাইনের ছাত্রীরা স্কুল ড্রেস পরে কলেজের ক্লাস রুমে ঢুকলো। শেষে ঢুকলেন শুভ্র বসনা, সুন্দরী ছিপছিপে গড়নের ইংলিশ ম্যাডাম। আমরা ট্রেনিংরত ছাত্রছাত্রীরা চারদিকে দাড়িয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে ম্যাডামের টিচিং পদ্ধতি দেখতে লাগলাম।

ক্লাসে ঢুকেই ম্যাডাম এদিক–ওদিক সামনে–পেছনে কি যেন খুজতে আরম্ভ করলেন। এবং এদিক ওদিক উকি–ঝুকি দিতে লাগলেন। তার কার্যকলাপে সকল ছাত্রীর কান খাড়া হয়ে গেল।

ম্যাডাম দরজার সামনে এলে এক ছাত্রী জিজ্ঞাসা করলো। কি হয়েছে ম্যাডাম, আপনি এতো বিচলিত কেন?

আমি আমার চশমা খুজে পাচ্ছি না। চশমা ছাড়া আমি কিছুই চোখে দেখি না। হায় হায় হায়, এখন পড়াবো কিভাবে? বলেই ভেউ ভেউ করে কেদে ফেললেন।

ছাত্রীরা সবাই উদগ্রীব হয়ে তার দিকে তাকালো। ক্লাসের চেচামেচি বন্ধ হয়ে গেল। ম্যাডামের ব্যথায় সবাই ব্যথিত হয়ে গেল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। পিন পতন নীরবতা। অ্যাটেনশন ড্র হয়ে গেল।

শিক্ষক হঠাৎ নিজের ব্যাগ খুলে বললেন, পেয়েছি, চশমা পেয়েছি। আমিই ভুল করে ব্যাগে রেখেছিলাম। আমার কি যে ভুলো মন!

মেয়েরা হেসে লুটপুটি। তাপর সেদিনের পড়া *ডেফোডিল* কবিতার ডেফোডিল–এর ছবি ব্ল্যাকবোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে চোখে সোনালি চশমা পরে প্রজাপতির মতো ম্যাডাম নেচে নেচে পড়াতে লাগলেন।

*কলাতিয়া, কেরানীগঞ্জ থেকে*

## পছন্দ

– ফেরদৌসী চৌধুরী

১৯৯৪ সালের কোনো একদিনের কথা। তখন আমি মাস্টার্স–এর ছাত্রী। অবিবাহিত। আমন্ত্রণ পেয়েছি আমার এক কাকার বিয়েতে। সবাই বিয়েতে যাবে। যার যার মতো সাজগোজ করছে। হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো, আমি চশমা চোখে দিয়ে যাবো। গোল্ডেন ফ্রেমের চমশা পরে আমি গেলাম।

ঘটনাক্রমে সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর আমার মনে হচ্ছিল, এক ভদ্রলোক আমার প্রতি বেশ আকৃষ্ট এবং অযাচিত আচরণ করছেন এবং কিছু বলতে চান।

অবশেষে বলেই ফেললেন, সিস্টার, আপনি কিসে আছেন? মানে আমি কোনো চাকরি করি কি না?

আমি কোনো চাকরি–বাকরি করি না। অকপটে বলে ফেললাম। কেননা বিশেষ কোনো মুহূর্তে মিথ্যা বলার অভ্যাস আমার ছিল না। তাও আবার এমন নাটকীয় মুহূর্তে! আমি আবার দেখতে আহা মরি নই। তাই তার অযাচিত আচরণ। আবেদনে কথা বলার স্পৃহা মেনে নিতে পারছিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, চশমা পরায় হয়তো আমাকে একটু অন্য রকম লাগছে।

মজার ব্যাপার, এরই মাঝে আমার এক অফিসার কাজিন বলে বললেন, তোমাকে খুব বিউটিফুল লাগছে।

ওহ! থ্যাংক গড। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তাৎক্ষণিক চশমায় ওই আনন্দ আমার কাছে খুব স্মরণীয়।

তবে ওই ভদ্রলোকের কৌতূহলী প্রশ্ন, কথা বলার আগ্রহে এটা পরিষ্কার প্রতীয়মান হলো যে, তিনি আমাকে কিছু বলতে চান। সহজ বোধোদয়ের মধ্যে দিয়ে বুঝে ফেলেছিলাম তিনি আমাকে পছন্দ করেছেন...। যদিও সে পছন্দের ব্যাপ্তি ঘটেনি।

যাই হোক। গোল্ডেন ফ্রেমের চশমাই ওই পছন্দের মূল কারণ। তাই চশমা নিয়ে ওই দিনের আনন্দ, অনুভূতি ছোট হলেও আমার কাছে অনেক বড়, অনেক প্রসারিত। এখনো চশমা পরলে ওই স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে।

*মতিঝিল, ঢাকা থেকে*

# বিড়ম্বনা

– মণি

তখন কেবল স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পা দিয়েছি। কৈশোরের উচ্ছলতা, আনন্দ সবই যেন উপভোগ্য মনে হতো। ইচ্ছা হতো, আরো কিভাবে স্মার্ট হওয়া যায়। কিভাবে বড় বড় ভাব আনা যায় সেই ভাবনা। মনে হলো সানগ্লাস পরলে নিজেকে অন্য রকম লাগবে। আগে থেকেই চশমার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। কেউ চশমা উপহার দিলে তাকেও ভালো লাগতো।

একবার এক বিয়েতে আমার পরিচিত এক ভাবী আমাকে অবাক করে দিয়েই একটা চশমা এনে হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমার।

আমি তো মহাখুশি। চশমা বলেই না কথা। আমারটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে তার দেয়াটা পরলাম। দেখলাম ভালোই লাগে। কিছু দিন পর সেই ভাবীর বাসায় নিমন্ত্রণের ডাক পড়লো। বেশ করে সেজে চশমাটা চোখে পরে গেলাম তার বাসায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে থেকে স্মার্ট ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ তাকালোও বটে।

যখন একটু একা হলাম, ভাবীর পক্ষের এক ছেলে এসে হঠাৎ বললো, এক্সকিউজ মি, চশমাটা কোথা থেকে কিনেছেন।

খুশি হলাম ভেবে, নিশ্চয়ই খুব সুন্দর লাগছে আমাকে। তাকে বললাম ভাবীর কথা। তিনি উপহার দিয়েছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সেই ছেলেটা ভাবীর সঙ্গে চশমা নিয়েই কথা বলছে। যাকে তর্কও বলা চলে। বুঝলাম এ চশমাটা কোথা থেকে এসেছে। ভাবীর ওপর ভীষণ রাগ হলো। তিনি যে ওই বিয়ে বাড়ি থেকে চশমাটা চুরি করেছেন তা বুঝতে একটুও সময় লাগলো না। সেটাই তিনি আমাকে দিয়েছেন যার প্রকৃত মালিক ওই ছেলেটা। তখন লজ্জায় নিজেকে কোথায় আড়াল করবো তা বুঝতে পারছিলাম না।

শেষমেষ সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে, যাক, ছেলেটা তো বোঝেনি যে, আমি বুঝে ফেলেছি চশমাটা তার।

তারপর থেকে কেউ চশমা উপহার দিতে চাইলে মনে শংকা জাগতো। চশমা নিয়ে এমন বিড়ম্বনায় যেন কাউকে পড়তে না হয়।

*পেয়ারপুর, মাদারীপুর থেকে*

# মনের গহীনে

– সুফিয়া জামান

সম্ভবত ষাটের দশকের শুরু। তখন আমার বয়স চার অথবা পাচ। তখনো স্কুলে ভর্তি হইনি। ভর্তির আগেই আমার বিদ্যানুরাগী পিতা আমার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন যাকে এখনো চোখ বন্ধ করে খেয়াল করলে স্পষ্ট দেখতে পাই। লম্বা, হালকা–পাতলা গড়ন। পরনে শাদা ধুতি। গায়ে ঢিলা শাদা ফুল

শার্ট। ইয়া বড় শাদা গোফ। চোখেও একটি ঢিলে চশমা। মেয়েদের মতো মাথার মধ্যে সিথি। সব ঋতুতে একটা ছাতা থাকতো সঙ্গে। নাম গুরুদয়াল বাবু। অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।

প্রথম দিন দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম। আব্বার কোলে বসে চোখ পিট পিট করে স্যারকে দেখছিলাম। চশমাটা ভারী সুন্দর! কালো ফ্রেম। মনে হচ্ছিল চশমাটা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্যারের নাকটা এতো খাড়া যে, চশমাটা নাকের আগায় আটকে আছে। চেহারাটা ভীষণ রাগী।

পরদিন থেকে লেখাপড়া শুরু হলো। তিন চার দিন আব্বা কাছে বসেছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ভয় ভেঙে গেল। যতোই দিন যেতে লাগলো, স্যারের কোমল মনটা প্রকাশ পেতে লাগলো। স্যারের প্রতিটি কথা আমার ভালো লাগতো। মনে রাখতাম এবং কাজে লাগাতাম। তিনি কখনো আমাকে বেত্রাঘাত করেননি। সব কিছু স্যারের মতো করতে চাইতাম, এমনকি হাতের লেখাও। একবার ক্লাস এইটে বাংলাস্যার আমার খাতা দেখে বললেন, এটা কার খাতা? গুরুদয়াল বাবুর হাতের লেখা কেন? আমাকে টেবিলের কাছে ডেকে নিয়ে স্যারের সামনে লিখতে বললেন। লেখা দেখে তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, এও কি সম্ভব!

দুধ খেতে চাইতাম না বলে স্যারের কাছে নালিশ করলেন আব্বা।

তিনি আমাকে দুধের গুণাবলী সম্পর্কে ছোটখাটো একটা ভাষণ শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, এখন থেকে প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাবে।

ব্যস, এরপর থেকে দুধ খেতে ভুল হতো না।

স্যারের স্কুলেই আমাকে ভর্তি করা হলো। প্রতিদিন তিনি স্কুলে যাওয়ার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমি তার দুটো আঙুল শক্ত করে ধরে হাটতাম।

তিনি যখন আমার ওপর ক্ষেপে যেতেন তখন চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে রাগী চোখে তাকাতেন।

আমি ফিক করে হেসে ফেলতাম।

সঙ্গে সঙ্গে স্যারের রাগ চলে যেতো। তিনি হাসি চাপতে অন্যদিকে তাকাতেন।

যখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি তখনো তিনি আমাকে নিয়মিত পড়াতেন। তিনি যখন আমাকে পড়া বোঝাতেন, স্যারের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ভাবতাম, আমিও বড় হলে স্যারের মতো শিক্ষক হবো এবং কালো ফ্রেমের চশমা পরবো।

সত্যিই আজ আমি শিক্ষক। সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হই এবং স্যারের মতো আমিও কালো ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করি। শুধু তাই নয়, আমিও মাঝে মধ্যে চশমার ওপর দিয়ে আমার ছাত্রছাত্রীর দিকে তাকাই। আশ্চর্য ঘটনা হলো, তারাও আমারই মতো ফিক করে হেসে ফেলে।

আজ আমার সে স্যার বেচে নেই। যদি তিনি বেচে থাকতেন তাহলে মজা করে এ ঘটনাগুলো তাকে শোনাতাম এবং তিনি হেসে আমার মাথায় মৃদু চাটি মেরে বলতেন, তোর সঙ্গে আমি আর পারিনে।

*গুলশান, ঢাকা থেকে*

# প্রক্রিয়া

– অনন্যা

আমার বিয়ে হয়েছে আজ দুই বছর। বাবার একান্ত ইচ্ছায় আমার এই বিয়েটা হয়েছিল। আমরা শহরে মানুষ হয়েছি সারা জীবন। শ্বশুরবাড়ি গ্রামে হওয়ায়, সেই সঙ্গে শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা আমার বাবার চেয়ে ভালো না এ জন্য ভাইবোন কেউ মেনে নিতে চাইছিলেন না এই বিয়েটা।

স্বামী আমার ধার্মিক। তার পোশাক-আশাক ধর্মীয়। খুবই সহজ-সরল এবং ভালো একজন মানুষ। সবাই চাইছিল সে তার পোশাকের ধারাটা পরিবর্তন করুক এবং আরো স্মার্ট হোক। প্রথমে তাকে চশমা পরে স্মার্ট বানানোর প্রক্রিয়া চললো।

বিয়ের কয়েকদিন পর সে আমাদের বাড়ি এলে আমার আব্বা তাকে বললেন, বাবা, একটা চশমা পরবে, দেখতে ভালো লাগবে।

কয়েকদিন পর আমাদের বাড়িতে একটা কম দামি চশমা কিনে পরে এলো। তা আমাদের বাড়ির সবাই ভালোভাবেই উপভোগ করলো।

কিছু দিন পর চশমাটা কেমন করে জানি ভেঙে গেল। কিন্তু সেটা আর কোনোভাবেই ঠিক করা গেল না। তখন আমার স্বামীর তেমন উপার্জন ছিল না বলে নতুন একটা চশমাও কেনা হলো না। তখনই মনে মনে চিন্তা করলাম যে, তাকে একটা দামি চশমা উপহার দেবো এবং সেই সুযোগ এলো। অর্থাৎ আমার বিয়ের তিন চার মাস পর আমার বিয়ের অনুষ্ঠান হলো। এবং সেই আমার শ্বশুরবাড়ি প্রথম যাওয়া। এবং সেই রাতে তাকে অন্যান্য উপহারের সঙ্গে একটা দামি চশমা দিই এবং চশমাটা দেখে সে খুব প্রশংসা করলো।

শ্বশুরবাড়িতে আমার বৌভাত-এর আগের রাতে কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটার জন্য শহরে গেলে ফেরার সময় রাতে পথে ডাকাতের কবলে পড়লে ডাকাতরা সব টাকা-পয়সা, ঘড়ি, সেই সঙ্গে আমার দেয়া চশমাটাও ডাকাতরা কেড়ে নেয়।

আমার কাছে এসে চশমাটার জন্য খুবই মন খারাপ করলো।

অবশ্য পরে তাকে একই রকম আরো একটা চশমা কিনে দিয়েছি। কিন্তু কেন জানি চশমাটা মাঝে মধ্যে দুই একদিনের জন্য হাওয়া হয়ে যায়। আবার হঠাৎ করেই পাওয়া যায়। যখন মাঝে মধ্যে চশমাটা পাওয়া যায় না তখন তাকে বলি, তুমি আমাকে মনে হয় তেমন ভালোবাসো না। তাই আমার দেয়া জিনিসও তুমি ধরে রাখতে পারো না।

তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব জোরে ঠোটে একটা চুমু দিয়ে বলবে, তোমার দেয়া জিনিস রাখতে না পারি। কিন্তু তোমাকে যেন সারা জীবন ধরে রাখতে পারি।

মাঝে মধ্যে যখন সে বলে, এই, চশমাটা কোথায়? খুজি পাচ্ছি না, একটু খুজে দেবে? তখন বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। আবার না জানি চশমাটা কোথায় হারিয়ে যায়। তখন তার চোখে দুষ্টুমির হাসি।

এখন অবশ্য সে তার নিজের উপার্জন দিয়ে এ রকম চশমা কিনতে পারে। কিন্তু আমার দেয়া চশমাটা সে খুব যত্ন করে রাখে। এখনো আমাদের পরিবারের সবাই তাকে নানান প্রক্রিয়ায় আরো স্মার্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এবং সেও তাদের খুশি করার চেষ্টা করে।

*রাজশাহী থেকে*

## দুর্ঘটনা

– রফিকুল

ছোট থেকে আমার মনে হতো, কোনোদিন যেন আমাকে চশমা চোখে দিতে না হয়। কিন্তু তা আর হলো না।

একদিন বিকেলবেলায় কৃকেট খেলার সময় একটি বল এসে সরাসরি চোখে আঘাত হানলো। আর যায় কোথায়! চোখ চেপে ধরে লাফ দিয়ে পড়লাম।

বন্ধু এসে আমাকে ধরাধরি করে ওঠালো।

ততোক্ষণে চোখের রক্ত আমার হাত বেয়ে পড়ছে।

বন্ধুরা সবাই মিলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডাক্তার চিকিৎসা করে চোখে ব্যান্ডেজ বেধে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এভাবে ছয় মাস চিকিৎসার পর একদিন অটো পাওয়ার চশমা দিলেন, সব সময় ব্যবহার করতে হবে। বাধ্য হয়ে চোখের প্রয়োজনে চশমা ব্যবহার করতে লাগলাম।

একদিন রাতের বেলায় এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেই বড় ভাই দেখামাত্র ভারিক্কি গলায় বললেন, কি রে রফিকুল, আজকাল রাতের বেলাতেও চশমা চোখে দিয়ে ঘুরছিস।
কি আর করা! বলে ফেললাম, বড় ভাই, কানার রাতই কি আর দিনই বা কি। দিনরাত সবই সমান।
আমার কথা শুনে তো বড় ভাই একেবারে অবাক!

*চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে*

# নিঃসঙ্গতা

– রুনা

স্কুল জীবনে আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী মোটা ফ্রেমের চশমা পরে স্কুলে আসতো। চশমা পরলে তাকে মাস্টারনির মতো দেখাতো। তার প্রেমিকটির ছিল একই রকম চশমা। তাই দেখে আমরা তাকে ক্ষেপাতাম তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য একটি চশমা কিনে রাখার কথা বলে। তখন কি জানতাম একটি চশমার জন্য আমার জীবনে কতো কি ঘটবে, কতো কিছু হারাতে হবে?
তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। আর কয়েকদিন পর বার্ষিক পরীক্ষা। লেখাপড়ার খুব চাপ। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন শুরু হলো প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। ডাক্তার দেখালাম।
ডাক্তার ওষুধ দিলেন এবং বললেন এতে যদি না হয় তবে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে।
ওষুধ খেয়ে কোনো কাজ না হওয়াতে গেলাম চোখ বিশেষজ্ঞের কাছে।
তিনি চোখ পরীক্ষা করে চশমা পরতে বললেন।
বাবা সামান্য চাকরিজীবী, এমনিতে দুজন ডাক্তার দেখানো এবং ওষুধে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাই পরের মাসে কিনে দিতে চাইলেন। আমি বাবার কথা মেনে নিয়ে মাথা ব্যথা সহ্য করেই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে লাগলাম।
একদিন প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছিল তাই পড়ার টেবিলে মাথা রেখে কাদছিলাম। হঠাৎ পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে মুখ তুলে দেখলাম আংকল, বাবার বন্ধু একটি বহুজাতিক কম্পানির বগুড়া শাখার ম্যানেজার। তিনি সব শুনলেন এবং চশমা ছাড়া পড়তে নিষেধ করলেন। ভয় দেখালেন, এভাবে পড়লে আরো ক্ষতি হবে। তাই আংকলই মাকে বললেন আমার চশমা কিনে দেবেন।
আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে বের হলেন চশমা কিনতে। একটা দামি ফ্রেম এবং অটো লেন্স–এর চশমা কিনে দিলেন।
স্কুলে আমাদের দুই বান্ধবীর দেখাদেখি অন্য বান্ধবীরাও চশমা পরতে লাগলো। আমরা পরিচিতি লাভ করলাম *চশমাওয়ালী গ্রুপ* নামে। এমনকি ম্যাডামরাও আমাদের এক নামেই সম্বোধন করতে শুরু করলেন। আমার বান্ধবীর প্রেমিকের বন্ধুটিও চশমা পরা শুরু করলো। যদিও তাকে আগে থেকেই পছন্দ করতাম। এখানে তার নাম দিলাম *এক্স*।
এক্স চশমা পরার পর থেকে তাকে ভালোবাসতে শুরু করলাম। সে একদিন আমার বান্ধবীর হাতে চিঠি পাঠালো। কারো চিঠি এতো সুন্দর হয় তা আমার জানা ছিল না। তার দীর্ঘ, অথচ সাবলীল, ঝরঝরে, ভালোবাসাময় চিঠিটি কতোবার যে পড়েছি বলতে পারবো না। চিঠির প্রতিটি প্যারায় সম্বোধন সূচক বাক্য, সেই সম্বোধনের বিস্তারিত বর্ণনা যার এক প্যারায় *চশমাওয়ালী* সম্বোধনটিও ছিল। এরপর থেকে এক্স–এর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো।
চশমা কিনে দেয়ার পর থেকে বিভিন্ন আবদার নিয়ে আংকলের কথা মতো তার অফিসে যেতাম। আংকল প্রয়োজনের চেয়ে বরং বেশিই দিতেন। স্কুল জীবন শেষ হয়ে আসছে, সব বান্ধবী পিকনিকে যাবে। কিন্তু

মাসের শেষ। তাই বাবার কাছে টাকা চাইতে পারলাম না। আংকলের অফিসে গেলাম, দেখলাম তিনি টেবিলে মাথা রেখে উহ আহ করছেন। জিজ্ঞাসা করার আগেই বললেন, খুব মাথা ধরেছে।

মাথা টিপে দিতে চাইলাম। তিনি সম্মতি দিলেন। সোফায় এসে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। মাথা টিপতে লাগলাম। এক সময় খেয়াল করলাম আমার শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় আংকলের হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবলাম অসচেতনভাবেই এমন করছেন। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত করে সরাসরি আমার স্তনে চাপ দিতে লাগলেন। আংকলের মুখের দিকে চাইলাম। তার চোখ বোজা। একবার মনে হলো চলে যাই। কিন্তু টাকার খুব দরকার, বান্ধবীদের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। তাছাড়া আমার পা যেন মাঠির মধ্যে গেথে গেছে এবং সারা শরীর কেমন জানি অবশ হয়ে আসছে। জীবনে প্রথম এ এক অন্য রকম অনুভূতি।

কতোক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। জামার হুকে হাত দিতেই আমার সংবিৎ ফিরে এলো। বাধা দিলাম।

আংকল নাছোড়াবান্দা, আমার ও দুটো তিনি দেখবেন।

আমি বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারলাম না।

তিনি আমার জামা খুলে ফেলে ও দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

আমি লজ্জায়, ভালো লাগায় চোখ বন্ধ করে রইলাম। গলা শুকিয়ে আসছিল। তবু এর মধ্যে তাকে টাকার কথা বললাম। আংকল আমাকে এভাবে রেখেই ড্রয়ার খুললেন এবং টাকা এনে আমার হাতে দিলেন। খুচরা নেই। তাই পাচশ টাকার নোট দিলেন এবং বললেন অন্য আরেকদিন এসে বাকি টাকা দিয়ে যেতে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে অবশিষ্ট টাকা আংকলের কাছে ফেরত দিতে যাবো ঠিক এমন সময় বান্ধবী এক্স–এর চিঠি দিল আমাকে। আমিও তাড়াতাড়ি জামার মধ্যে চিঠি লুকিয়ে রাখলাম। অফিসে গিয়ে আংকলের মুখের দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারছিলাম না সেদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাটির জন্য। টাকাটা বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে।

তিনি টাকা না ধরে এক হাতে আমার হাত ধরলেন এবং এক হাত আমার বুকে কোনো ভনিতা না করেই। এক্স–এর চিঠির ওপর তার হাত পড়লো। তিনি হাত ঢুকিয়ে চিঠি বের করলেন। পড়ার পর বললেন এক্স–এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

আমি প্রতিবাদ করলাম।

আংকল তখন আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ড্রয়ার থেকে যা বের করে টেবিলে রাখলেন সেটা দেখে আমার মাথা ঘুরে উঠলো। মনে হলো আমার পায়ের তলায় মাটি নেই। এ ছবিটি তিনি সম্ভবত সেদিন টাকা বের করার সময় পেছন দিক থেকে তুলেছিলেন আমার অগোচরে। চশমা পরা অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে বসে আছি।

এরপর ভিলেইনের মতো আমার বিবস্ত্র ছবিটি যথাস্থানে রেখে আবার হাত ধরে বললেন, তার কথা না শুনলে ছবিসহ চিঠিটি আমার বাবার কাছে পাঠাবেন।

আমার কানে তখন কিছু প্রবেশ করছিল না।

এ অবস্থায় আমার হাত ধরে আবার সোফায় নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন।

আমি সম্মোহিতের মতো নিজেকে সমর্পণ করলাম।

ফেরার সময় শিখিয়ে দিলেন কিভাবে এক্স–এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং কতোদিন পর পর তার অফিসে হাজিরা দিতে হবে।

আমি তার ক্রীড়নকে পরিণত হলাম।

আংকলের স্বরূপ আমার কাছে উন্মোচিত হয়ে গেল। ঘোর লাগা অবস্থায় বাসায় ফিরলাম। সারা রাত শত চেষ্টা করেও দুই চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। শুধু কেদে কেদে বালিশ ভেজালাম। প্রচণ্ড ঘৃণা হতে

লাগলো নিজের ওপর। মনে পড়লো এক্স–এর কথা। আংকলের কথা মতো মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এক্স–এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। চমৎকার অভিনয় করলাম। বান্ধবীরা অবাক হয়ে গেল আমার ব্যবহার দেখে। কিন্তু কেউ জানতে পারলো কোনো সুতার টানে আমি নাচছি।

বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিলাম। কয়েকদিন পর এসএসসি পরীক্ষা। তাই স্কুলেও যেতে হতো না। শুধু বান্ধবীদের বাসায় নোট আনার কথা বলে ওই লম্পট আংকলের কাছে হাজিরা দিতে হতো।

কলেজে ভর্তি হলাম। তবুও নিস্তার পেলাম না। এক সপ্তাহ না গেলেই আমাদের বাড়ি আসতো। ইশারায় শাসাতো, না গেলে...!

দিনের পর দিন মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করতে লাগলাম। আমার কিছু করার নেই বিধাতাকে ডাকা ছাড়া।

একদিন অফিসে যেতেই একটা সুন্দর দামি সানগ্লাস বের করে আমাকে পরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার জন্যই নাকি এটা কিনেছেন।

মনে মনে ভাবলাম এক চশমার জন্য যে চড়া মূল্য আমাকে দিতে হচ্ছে...। আমি ফিরিয়ে দিলাম।

তিনি জোর করে আমাকে পরিয়ে দিয়েই জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক এমন সময় তার স্ত্রী ঝড়ের বেগে রুমে ঢুকলেন, সঙ্গে আমার বাবা।

বাবা আমার গালে কষে একটা থাপ্পড় মারলেন। সানগ্লাসটি ছিটকে কোথায় চলে গেল জানি না।

হতবাক আমি জ্ঞান হারালাম। সেই থেকে আমি আর কোনোদিন চশমা পরিনি, পরবো না। চশমার কথা মনে হলেই ঘৃণা লাগে, নিজেকে অপবিত্র মনে হয়।

এ ঘটনার পর বাবা কেমন জানি বদলে গেলেন। সব সময় উৎফুল্ল থাকতেন তিনি হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেলেন। আমার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। বাবা বলতেন, যতো কষ্টই হোক, আমাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করাবেন। চাকরিজীবী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। সেই বাবা অনেক বয়সী একটা ব্যবসায়ী পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করলেন। না করতে পারলাম না কারণ আমার ভুলের জন্যই বাবাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাছাড়াও বাবা আর আগের মতো নেই। তিনি আমার সঙ্গে কথাও বলেন না। বাবার সামনে দাড়ানোর মতো মুখও নেই আমার। বিনা প্রতিবাদে বাবার কথা মেনে নিলাম।

বিয়ে হয়ে গেল। স্বামীর বাড়িতে চলে এলাম। স্বামী সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাতে। ঘরে ঢুকেই শুরু করে মদ্যপান, তারপর ঘুম। আমার ইচ্ছা, অনিচ্ছা এসবের কোনো দামই নেই তার কাছে। আমার দরকার ছিল একটি ফুটফুটে সন্তান যার মুখ চেয়ে আমি সব ভুলে থাকতে পারবো, যে আমার নিঃসঙ্গতা দূর করে দেবে। কিন্তু বিধাতা এখনো বঞ্চিত রেখেছেন এই সুখ থেকে, শত চেষ্টা করেও সন্তান ধারণ করতে পারিনি। দুজনেই ডাক্তার দেখিয়েছি, কোনো সমস্যা নেই। তবুও হচ্ছে না সেটা কি আমার পাপের জন্য, নাকি এক্স–এর অভিশাপের জন্য, জানি না। আমার কেবল মনে হয় আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীর মূলে দায়ী ওই একটি চশমা।

*পূর্ণ ঠিকানা বিহীন*

## দোকানের মা

– আনোয়ার

আমি আমার গর্ভধারিণীকে ডাকি আম্মা। এরপর আছেন আমার একজন মা। আজ সেই মায়ের কিছু কথা এখানে তুলে ধরছি। সেই ছোটবেলায় আমরা তিনটি পরিবার তল্লা এলাকায় ভাড়াটিয়া বাড়িতে পাশাপাশি থাকতাম। অর্থাৎ আমরা, বাবুলভাইয়েরা আর দোকানের মা। দোকানের মা মানে, আমাদের পাশের ঘরে এক মুদি দোকানদার থাকতেন তার স্ত্রী নিয়ে। তাদের কোনো সন্তান ছিল না। দোকানদারকে আমি কাকা এবং তার স্ত্রীকে মা ডাকতাম।

বাবুলভাই এবং তার বোনেরা দোকানদারকে দোকানের আব্বা, তার স্ত্রীকে দোকানের মা ডাকতেন। তাদের দোকানে মিন্টু নামে একটি ছেলে কাজ করতো। তাই তারা মিন্টুর মা–বাবা হিসেবেই সবার কাছে পরিচিত ছিলেন।

এই বাড়িতে মোট ১৫ ঘর ভাড়াটিয়া ছিল। অবশ্য ছেলেটি বড় হয়ে তার নিজ পরিবারে চলে যায়। আমরা বুঝতে শিখে মিন্টুকে দেখিনি।

সেই ছোটবেলায় তারা যে আমাদের কিভাবে বা কি দিয়ে আদর, স্নেহ করতেন বা ভালোবাসতেন তার ভাষা আজও খুজে পাই না। মিন্টু চলে যাওয়ার পর তাদের সকল ভালোবাসা শুধু আমরা এই কয়েকজনই পেতাম। এর কিছু দিন পর ডলি নামের একটি ছোট মেয়েকে তারা পালক আনেন। তবে তাতে করে আমাদের ভালোবাসার কোনো ঘাটতি পড়েনি। আজও আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, মা মোটা–কালো ফ্রেমের চশমা পরতেন। নাকে শাদা পাথরের নাকফুল শাদা–কালোর সংমিশ্রণে যে সৌন্দর্য ফুটে উঠতো তা লিখে প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। পৃথিবীর সাধারণ নিয়মে বড় হয়ে আজ মায়ের সেই সৌন্দর্য মাখা, হাসি ভরা মুখখানা দেখা থেকে বঞ্চিত। আজ মনে হয়, মাকে চশমার জন্যই এতো সুন্দর লাগতো।

আজ আমার বয়স চল্লিশ বছর। আমার মা বহুদিন আগেই তাদের গ্রামের বাড়িতে বসবাস শুরু করেছেন। শহরে এলে অবশ্যই আমাদের এখানে বেড়াতেন। জীবনের একটা সময় ১৯৯৭ সালে কাজের খোজে সিংগাপুর যাই। দেশে এসে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। সঙ্গে আমার দুই বোন এবং তাদের এক বন্ধু ছিল। দুপুরে খাবারের সময় মা জলপাইয়ের আচার দিয়েছিলেন। তারপর আর মায়ের হাতের খাবার ভাগ্যে জোটেনি। সারাটা দিন খুব আনন্দ করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরলাম। সেই দিন মাকে সামান্য উপহার দিয়েছিলাম। মা যে কতোটা খুশি হয়েছিলেন তা বলার নয়। মনে হয়েছিল আমার মা তার মধ্যবয়সের সেই হাসিমাখা মুখখানা তখন সেই বয়সে তুলে ধরছেন।

এর কিছু দিন পর মা, কাকা এবং তাদের পালক মেয়ে তার স্বামীসহ বাবুলভাইদের বাসায় এলে আমাকে খবর দেয়া হয়। তাদের সবাইকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসি।

আমার ছোট বোন বললো, দাদা, কাকাকে একটি চশমা কিনে দেন।

অবশ্য তার তখনো চশমা ছিল। এবং আমি ছোটবেলা থেকেই দেখি কাকা চশমা পরেন।

যেই কথা সেই কাজ। ভাইবোনে মিলে কাকাকে নিয়ে কালির বাজারে এক পরিচিত চশমার দোকানে নিয়ে গেলাম।

দোকানদার দেখেশুনে বললেন, তিনি এক চোখে খুব সামান্য দেখেন, অন্য চোখে মোটামুটি দেখেন।

দোকানদার তার অভিজ্ঞতার আলোকে একটি চশমা দিলেন। দাম আমার ধারণার চেয়ে অনেক কম রাখলেন। কিন্তু ওই দিন তার চোখে মুখে যে আনন্দ দেখেছিলাম তা ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। বাসায় এসে ঠিক এই রকম আনন্দ দেখেছিলাম আমার মায়ের চোখেও। তারপর আজ দীর্ঘ ছয় বছরের মধ্যে তাদের কোনো খবর জানি না। প্রবাসী জীবনের এই ব্যস্ততার মধ্যে তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। আজ বড় জানতে ইচ্ছা করে, তাদের এই শেষ জীবনের দিনগুলো কিভাবে কাটছে!

*সউদি আরব থেকে*

## প্রেমের কারণ

– দিয়া

যখন আমি সদ্য কিশোরী অর্থাৎ তেরো চোদ্দ বছর বয়স তখন একদিন আমরা কয়েকজন শাড়ি পরলাম শখ করে। সেদিন সন্ধ্যায় পাড়ার এক আপুর বাসায় বেড়াতে গেছি কয়েকজন মিলে। এমন সময় আপুর প্রেমিক এলেন তার সঙ্গে কথা বলতে।

তিনি কথা বলতে লাগলেন আর আমি গেট ধরে দাড়িয়ে রইলাম। কাছে কোনো আলো নেই। দূরের ল্যাম্প পোস্টের আলো এসে পড়েছে আমার ওপর।

আপুর প্রেমিক যেন কেমন উসখুস করছেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করে ফেললেন হঠাৎ, উনি কে?

আমি তো অবাক। কারণ তিনি আমাকেও ভালো করেই চেনেন, এখন এ প্রশ্নের কি মানে?

আপু হেসে বললেন, ওতো দিয়া।

তিনিও হো হো করে হেসে ফেললেন।

এতোক্ষণ তিনি আমাকে নাকি খালাম্মা ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন। অপমানে মুখ কালো হয়ে গেলেও হাসতে হলো। বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের পেছনে ছিল আমার চোখের চশমা। এরপর থেকে চশমা পরা বাদ দিয়েছি। কলেজে ওঠার পর ডাক্তারের পরামর্শে আবার বাধ্য হলাম চশমা পরতে।

এবার দেখা গেল, আমি যে ফার্মে কমপিউটার শিখতাম সেখানের এক ভাইয়া আমার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং অবিকল আমার মতো চশমা পরা শুধু করলেন। এ নিয়ে সবাই হাসাহাসি শুরু করলো। ওনার ক্রমবর্ধমান প্রেমের কারণেই কমপিউটার শেখার আশা বাদ দিতে হলো।

হায়রে চশমা! চশমার কারণে যে কেউ প্রেমে পড়ে তা এই প্রথম দেখলাম। আনন্দময় অভিজ্ঞতাটা বলবো  না, এটা শুধুই আমার নিজস্ব।

*মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে*

## এপার- ওপার

– রেজা মু. হাবিবুল্লাহ

কোনো কিছু পড়লেই কয়েকদিন ধরে মাথা ব্যথা হচ্ছে। বুঝতে পারছি না হঠাৎ কেনই বা এর উদ্ভব হলো। ডাক্তারের কাছে গেলাম।

ডাক্তার অনেকগুলো টেস্ট করাতে বললেন।

টেস্টের ফলাফল নরমাল হলো।

ডাক্তারের কথা, কোনো সমস্যা নেই। দুশ্চিন্তা থেকে এ রকম মাথা ব্যথা হতে পারে। তা কোনো রোগের পর্যায়ে পড়ে না। ডাক্তারের কথা শুনে চিন্তামুক্ত হলাম। যে যুগ পড়েছে, কোনো কিছুর সমস্যা দেখা দিলে তা থেকে ক্যান্সার ধরা পড়ছে। আবার মাথার ব্যথা! কোনো সময়ই আমি মাথার সমস্যাকে ছোট করে দেখতে চাই না।

কিছু দিন পর আবার তা চরম আকার ধারণ করলো। এখন মাথা দুই হাত দিয়ে ধরেও রেহাই পাই না। সিদ্ধান্ত নিলাম এভাবে চলা আর সম্ভব নয়। ঢাকাতে ভালো একজন বিশেষজ্ঞকে দেখাবো।

সে সময় চাচা এসে বললেন, আমি কলকাতাতে যাবো, ইচ্ছা করলে তুইও যেতে পারিস। ওখানের চিকিৎসা বেশ ভালো। এখন পর্যন্ত খুব কম লোকের মুখেই শুনেছি ইনডিয়ায় গিয়ে খারাপ চিকিৎসা পেয়েছেন।

আমি জানি, কলকাতায় চিকিৎসা আমাদের থেকে ভালো এবং শস্তা। কিন্তু আমার যে পাসপোর্ট নেই।

সমস্যা নেই, আমি সব কিছু করে নিতে পারবো। এখনো হাতে চোদ্দ পনেরো দিন সময় আছে।

চাচার সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের লোকদের ভালোই সম্পর্ক। ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইনডিয়াতে যেতে হয় বলে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাই চাচার পক্ষে তা সম্ভব আমি জানি। আমাদের দেশের এ কালচারটা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে। সরকারি কাজে যদি অফিসের লোকজনের সঙ্গে ভালো জানা-পরিচয় থাকে তবে যে কোনো কাজ তাড়াতাড়ি করে দেবে। আর যাদের লোকজন নেই তারা নিয়মতান্ত্রিক জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাবে অথবা টাকার বিনিময়ে মুক্তি পাবে।

সত্যিই পনেরো দিনের অনেক আগেই ১৮ ডিসেম্বর পাসপোর্ট রেডি হয়ে গেল। পাসপোর্ট হলে চাচা ইনডিয়ান হাই কমিশনের অফিস থেকে আমার জন্য দশ দিনের চিকিৎসা ভিসাও বের করে আনলেন। নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর ২০০২-এ আমরা ইনডিয়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মাইক্রোবাসে করে সোনা মসজিদ স্থল বন্দরে পৌছি। সেখানে চাচা কয়েকজন সিএন্ডএফ এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলা পর বারোটার মধ্যেই এপারে আমাদের ইমিগ্রেশন শেষ করলো কাস্টমস অফিস কর্তৃপক্ষ।

বারোটার পর আমরা সীমান্ত পার হয়ে ইনডিয়ার ভেতরে ঢুকলাম। ইনডিয়ার ইমিগ্রেশন পর্ব শেষ করার পর সড়ক পথে ট্যাকসিতে করে মালদহ জেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। বন্দরের যে প্রধান রাস্তাটি বাংলাদেশ হয়ে ইনডিয়ার ভেতর প্রবেশ করেছে সেই রাস্তার ধারেই ট্যাকসি দাড়িয়ে থাকে এপারের যাত্রীদের পরিবহনের জন্য। প্রায় দুই আড়াই ঘণ্টা জার্নির পর আমরা মালদাহ জেলায় প্রবেশ করি। সেখানে একটা আবাসিক হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার পর রেস্ট নিই। এখান থেকে স্টেশনে যাই। রাতের ট্রেনে করে কলকাতা যাবো। টিকেট কাউন্টারে গিয়ে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাস বগিতে কোনো সিট না থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেকেন্ড ক্লাস বগিতে দুটি টিকেট কেটে ওয়েটিং রুমে বসে আছি। সময় কাটছে না। সোনা মসজিদ থেকে ঢাকার পত্রিকা যুগান্তর কিনেছিলাম। পত্রিকার হেডলাইনগুলো দেখছি।

একজন ত্রিশউর্ধ মহিলা আমাদের সিটের অপজিটে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর চাচার দিকে তাকিয়ে বললেন, এক্সকিউজ মি, আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?

জি

কোথায় যাবেন?

কলকাতায়।

ও আচ্ছা। এর কিছুক্ষণ পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভীষণ বোর লাগছে, হাতের কাছে কিছু নেই যে পড়বো!

যুগান্তরের প্রথম পাতাটি রেখে ভেতরের পাতাগুলো তাকে দিলাম।

ভদ্রতা দেখিয়ে একটু হেসে ধন্যবাদ জানালেন।

সিদুর লাগানো, চশমা পরা সুশ্রী এই বাঙালি নারীর হাসিতে যে কোনো মন ভালো হয়ে যাবে। মহিলাটি ছিলেন ব্যক্তিত্ববান ও মুডি।

তোমার অনুমতি ছাড়া তুমি বলা শুরু করেছি এ জন্য ক্ষমা করবে।

তাতে কি হয়েছে। তুমি না বললে কি সত্যিকারের দিদি হওয়া যায়। কালকাতায় নামার আগে বললেন, শোনো, আমার স্বামীর একজন বন্ধু ডা. বাসু রায়। খুব ভালো চোখের ডাক্তার। আমার মনে হয়, তোমার মাথা ব্যথার কারণ এ চোখের সমস্যার সম্পর্ক থাকতে পারে। তোমরা যে হোটেলে উঠবে তার নাম আমাকে দিও। তোমার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করে তার কাছে নিয়ে যাবো।

ভেবেছিলাম তা হয়তো কথার কথা।

কিন্তু সত্যিই একদিন সকালে হোটেলে এসে দিদি হাজির।

আমি তো দিদিকে পেয়ে মহা খুশি। এদিকে চাচাও ব্যবসার কারণে আমাকে সময় দিতে পারছিলেন না।

ডা. বাসু রায় খুব যত্নের সঙ্গে আমার চোখের পরীক্ষা করে বললেন, চোখের সমস্যা হচ্ছে মাইগ্রেন হয়েছে বলে। তার জন্য মাথা ব্যথা। চশমা নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

চশমার দোকানে গিয়ে ফ্রেম পছন্দ করছি। অনেক খোজার পর দিদির মতো একটা হালকা ফ্রেম পেলাম।

দিদিকে দেখালে তিনি বললেন, এটাতো আমার মতো ফ্রেম!

তাই তো নিচ্ছি।

কেন, এই ফ্রেমটা খুব ভালো লেগেছে?

না, তোমাকে ভালো লেগেছে তাই, তোমার চোখের অবয়ব নিয়ে যাচ্ছি তোমার কথা স্মরণ রাখার জন্য।

দেশে গেলে আমার কথা মনে থাকবে?

চশমা দেখে মনে করবো।

এরপর দিদি আমাকে আর ফ্রেমের দাম দিতে দিলেন না। বললেন, চশমার ফ্রেমটি তার উপহার।

আসার দিন দিদি আমাদের সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন। তখন আমার চোখেও দিদির চশমা ঝুলছিল। ট্রেন ছাড়ার সময়ে দিদি হেটে প্ল্যাটফরম দিয়ে চলে যাচ্ছেন। পেছন থেকে দেখতে পেলাম, ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চশমা খুলে চোখে মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

যতোদিন কলকাতা ছিলাম, দিনগুলো খুব ভালোই যাচ্ছিল। ছেড়ে আসার সময় মনে হলো, কোনো আপনজনকে ছেড়ে চলে আসছি।আসতে তো হবেই। এটাই তো সত্য।

*দক্ষিণগলি, রাজশাহী থেকে*

# নানির সংগ্রহ

– সমুদ্র

আমরা তখন অনেক ছোট। পাড়া–প্রতিবেশীর বাচ্চাদের স্বরে আ আর ম *আম,* ক আর র *কর,* শুনে সকালে ঘুম ভাঙে। তারা সবাই আমার নানির কাছে পড়ে। পড়েছে তাদের বাবা–মা–রাও। পেশা নয় মোটেই, তবে নেশা বলা যেতে পারে। আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর প্রায় সবাই তাদের দুই প্রজন্ম নানির কাছে পেয়েছে তাদের প্রথম পাঠ। কারো বড়মা, কারো দাদি আবার অনেকের লালদাদি (খুব ফর্শা সেই জন্য বোধহয়), আমার নানি। যাহোক ঘটনাটা অন্তত পচিশ বছর আগের। তারচেয়ে বেশি ছাড়া কম হবে না।

হঠাৎ একদিন সকালে উঠে শুনি নানির চশমা পাওয়া যাচ্ছে না। নানির কোনো জিনিস হারানো মোটামুটি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার মতো গোছানো, পরিপাটি আর শৃঙ্খলা পরায়ণ মানুষ আরেকটা পাওয়া খুবই দুষ্কর। আমাদের ধারণা, তার পোষা বিড়াল, হাস–মুরগিও তার আইন মেনে চলে। সেই নানির ঘর থেকে তার চশমা গায়েব!

আমাদের বাড়িতে একটা ঘটনা মানে তো আর শুধু আমাদের পরিবারের লোকজনই না, নানির ছাত্রছাত্রী, তাদের বাবা–মা অর্থাৎ পাড়া–প্রতিবেশী খালা–বুবু মিলে সে একটা মহা হই চই কাণ্ড। সাব্যস্ত হলো হাত চালান হবে। কোনো এক মুরুব্বি খালা মন্ত্র জানেন। তুলা রাশির জাতক বা জাতিকার হাতে, আঙুলের ফাকে দিয়ে দেয়া হবে মন্ত্র পড়া গাছ। হাত নিজেই চলতে থাকবে মন্ত্রের গুণে এবং চলতে চলতে পৌছে যাবে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর কাছে। কিংবা কেউ চুরি করে থাকলে হাত তার শরীর স্পর্শ করে থেমে যাবে।

অনেক খোজাখুজির পর পাওয়া গেল তুলা রাশির জাতিকা। সবার মনে বেশ উত্তেজনা। সবাই উৎসুক হাত কিভাবে চলে আর কে ধরা পড়ে সেটা দেখার জন্য।

উঠানের মধ্যখানে একটুখানি জায়গা লেপে তৈরি করা হলো মঞ্চ। এখান থেকেই শুরু হবে হাতের যাত্রা। আমার এখনো মনে আছে, উঠানের মধ্যে থেকে সোজা পশ্চিম দিকে রওনা হলো হাত তার সঙ্গে সঙ্গে হাতের মালিক এবং বাড়িসুদ্ধ লোক। হাত চলছে, চলছে। প্রবেশ করলো আমাদের বৈঠকখানা ঘরে আমরা ওটাকে অবশ্য ছোট ঘর ডাকতাম। আরো এগিয়ে গেল হাত, এবার ডানে মোড়। কিন্তু একি, ডানে তো দেয়াল? হাত থেমে নেই। সবাইকে অবাক এবং হতাশ করে দিয়ে দেয়াল বেয়ে উঠতে থাকলো হাত, আরো উপরে, একদম চাতালে। চাতাল হলো টিনের চালের নিচে বাশ কাঠের তৈরি ছাদ। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের এই ঘরের চাতাল এবং টিনের মধ্যে কোনো ফাকা জায়গা নেই। তাহলে?

আবারও চালান হলো হাত প্রথম থেকে। একবার দুবার মোট তিনবার। কিন্তু প্রতিবারই হাত গিয়ে থামে চাতালে। সুতরাং অনেক গবেষণা, জল্পনা–কল্পনার পর ধরে নেয়া হলো কাজটা কোনো ধাড়ি ইদুরের। কিন্তু ওই চাতাল থেকে চশমাটা (যদি সত্যিই ওখানে থেকে থাকে) আর উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। সবাই মনে মনে কিছুটা নিরাশ অবশ্য হয়েছি। কারণ চোর ধরা পড়ার দৃশ্যটা তো দেখা গেল না। আগের পণ্ডিতজিদের *ট্রেড মার্ক* মার্কা (এখানকার হ্যারি পটার গ্লাসেস) স্টিলের ফ্রেমের নানির সেই চশমার এখানেই সমাধি।

অবশ্য এই চশমার আবির্ভাবটাও ছিল বেশ ঐতিহাসিক। আমাদের বাড়ির পেছনেই বিরাট আনসার ক্যাম্প। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানে ঘাটি গেড়েছিল পাকসেনারা। তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর পাড়ার ছেলেরা ওই আনসার ক্যাম্পের পুকুর থেকে পাক সেনাদের ফেলে যাওয়া অনেক কিছু উদ্ধার করে। তার মধ্যে থ্রি নট থ্রি–র অজস্র গুলি থেকে শুরু করে থালা–বাটি–বাসন সবই ছিল। নানির সেকালের ছাত্ররা উপঢৌকন হিসেবে বেশ কিছু জিনিস নানিকে দেয়। কিন্তু আমার নানা ছিলেন খুব নীতিবান মানুষ। সকলের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় স্টেশন মাস্টার। তার বিচারে এসব জিনিস অবৈধ, নেয়া ঠিক না। তাই তিনি ওই সব থালা–বাটি নিয়ে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। অবশ্য ওই কর্তৃপক্ষ এগুলো দিয়ে কি করেছে তা আজও আমাদের প্রশ্ন।

নানার চোখের আড়ালে ছোট যে দুই একটা জিনিস বাড়ির মেয়েরা সরিয়েছিল তারই একটা ছিল ওই চশমা। কোনো ডাক্তারের প্রেসকৃপশনে কেনা নয়।

এই ঘটনার বেশ কিছু দিন পর হঠাৎ একদিন নানির ঘরে দেখি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মতো মোটা কাচওয়ালা কালো ফ্রেমের একটা চশমা। এবং এটারও মডেল অবশ্যই পার্টিশনের (১৯৪৭) আগের।

চিৎকার করে বললাম, নানি এটা কোথায় পেলেন?

নানির সংক্ষিপ্ত উত্তর, ওই ট্রাংকে ছিল।

নানির ট্রাংকে এখনো বৃটিশ আমলের অনেক ম্যাগাজিন, কাননবালা, মধুবালার ছবি এবং এ রকম আরো অনেক কিছু সুরক্ষিত আছে। আর ওই সব ট্রাংক আমাদের সামনে কখনো খোলা হয় না।

বললাম, নানি এই চশমার তো অনেক পাওয়ার, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এটা পরলে আপনার চোখের হায়াত যা বাকি ছিল তা দুদিনেই শেষ হবে।

তোরা ডাক্তার দেখা গা, আমার ডাক্তার লাগে না।

পুরনো দিনের মানুষ, কে বোঝাবে তাকে? আমার তো সব সময় লাগে না। কিন্তু পড়ার সময় চশমা লাগে। চশমা ছাড়া এখন আর পড়তে পারি না রে ভাই।

নানির এই কথাটাও পুরোপুরি সত্যি নয়। পড়তে গেলেই যে তার চশমা লাগে, আমার তা মনে হয় না, কারণটা বলি।

আমাদের বাড়িতে সব সময়ই অন্তত একটি দৈনিক এবং এক বা একাধিক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত আসে। প্রতিদিন দুপুরবেলা (মফস্বলে হকার আসে দুপুরে) পত্রিকা আসার সময় হলেই একটা অঘোষিত কোল্ড কমপিটিশন চলতে থাকে আমাদের মধ্যে কে আগে হকারের হাত থেকে পেপারটা নেবে। কারণ ছাড়াই নানি বাড়ির গেটের বাইরের উঠানে হাটাহাটি করেন। এটা তার অভ্যাস। কিন্তু ঠিক এই সময়টায় তার হাটাহাটিটা একটু বেড়ে যায়। আব্বাও সুযোগের অপেক্ষায় বারান্দায় বসে থাকেন। আম্মা, মূলত যার কারণেই এ বাড়িতে পেপার পত্রিকা আসে, তিনি অবশ্য এ প্রতিযোগিতায় আসেন না। কেননা তার সব পড়ালেখা শুরু হয় গভীর রাতে।

হকার এলে নানি পেপার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর ঢোকেন না, রিস্ক আছে। ওখানেই দাড়িয়ে পেপার পড়তে থাকেন। মজার ব্যাপার হলো, এ সময় তার চোখে কোনো চশমা থাকে না। চশমা ছাড়াই দিব্যি পড়ছেন। চশমা আনতে হলে বাড়ির ভেতরে যেতে হবে আর ভেতরে গেলেই পেপারটা হাতছাড়া হওয়ার

ভয়। তাই চশমা ছাড়াই বাইরে দাড়িয়ে, কাপা কাপা হাতে পেপার নিয়ে, কুঞ্চিত ভ্রূ আরো কুঞ্চিত করে নিবিষ্ট মনে পড়তে থাকেন।

আমার নানির বয়স পচানব্বই পেরিয়ে গেছে। আব্বাও রিটায়ার করেছেন বছর চারেক। আমাদের পাচ ভাইবোনের মধ্যে শুধু ছোট বোনটিই এখন রয়েছে বাড়িতে। আমি তবু নিশ্চিত জানি, আব্বা, আমার ছোট বোন এবং নানির মধ্যে দুপুরবেলার পেপার নিয়ে কাড়াকাড়ির ব্যাপারটা চলছে এখনো।

খুব ছোট থেকেই বাড়ি থেকে দূরে দূরে থাকতে হয়েছে আমাকে জীবনের বেশির ভাগ সময়। এই সব খণ্ড খণ্ড স্মৃতি সব সময়ই আমাকে সঙ্গ দিয়েছে, আজও আটলান্টিকের এপারে বসে ওই সব খণ্ড খণ্ড ছবিগুলো চলচ্চিত্রের মতো চোখের সামনে ভাসতে দেখি যখন-তখন।

*নিউ ইয়র্ক থেকে*

# এক পলকের ছোয়া

– রাজীব নূর

ছোট একটা সানগ্লাস। তারচেয়েও ছোট একটা স্পর্শ, অথচ কি প্রবলভাবেই না এখনো তা উপস্থিত আছে আমার মস্তিষ্কে। মনে পড়ে তোমার?

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেই কবে, চাকরির সূত্রে চট্টগ্রামগামী রেলের কামরায়। প্রথম দেখায় বুকে আলোড়ন তুলবে এমন কেউ ছিলে না তুমি। বলতে গেলে বেশ শাদামাটাই। তবে শুরুতেই বন্ধুত্ব হলো। সেটিও বিশেষ কিছু নয়, বরং সম্বোধনে অন্য কলিগদের চেয়ে আমার সঙ্গে দূরত্বটাই ছিল বেশি। তারপর চলে গেলে অন্য ঘরে। যাওয়ার সময়ও অনুভব করিনি জমাট কোনো কষ্টের ব্যথা। স্বাভাবিকভাবেই ভাবিনি, আমারই বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।

বহমান নদীর মতো এগিয়ে চলে সময়। এখন আমাদের একই *স্টেশনে* কাজ, একই গাড়িতে যাতায়াত। তোমাতে সময় যেন উল্টো পথে চলে। তুমি বিকশিত হয়ে ওঠো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে আর শারীরিক সৌন্দর্যে। তোমাকে আবিষ্কার করি অন্য আলোয়। জীবনানন্দের চিত্রকল্পের অনুরণন তুলে মনে মনে বলি, *এতো দিন কোথায় ছিলেন?* তোমার চুল এলানো, ঘাড় বাকানো হাসি এখন আমার বুকে কাপন জাগায়। পাশাপাশি বসার সময় তোমার শরীরের ফরাশি সৌরভ আমাকে স্পর্শ করে। অবচেতনে কি তীব্রভাবেই না তোমাকে পেতে চেয়েছি নিবিড়ভাবে। আমার ভেজা স্বপ্নগুলো হয়ে উঠেছে তুমিময়। তোমার সপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলি। তোমার প্রতি এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

তুমি সবই বোঝো। কিন্তু তা বুঝতে দিতে চাওনি কি এক রহস্যময়তায়। আর সে রহস্যময়তা যার সঙ্গে মিশে থাকে তোমার স্বতঃস্ফূর্ত Art of flirting তোমাকে আরো মোহনীয়, আরো আকর্ষণীয় করে তোলে আমার কাছে। তুমি এখন আর আমার দু'শজন বন্ধুর একজন নও, বিশেষ একজন, সম্ভবত বেস্ট ফ্রেন্ড।

সময় এগিয়ে চলে। এবার পোস্টিং ঢাকার বাইরে। আগের অফিসে তোমার সঙ্গে যে দূরত্ব ছিল, নতুন জায়গায় তা আরো কমে আসে টেলিফোনের বদৌলতে। তোমার সঙ্গে আলাপ চলে মিনিটের পর মিনিট, কখনো বা ঘণ্টা হিসেবে। আলাপ হয় অফিস, বন্ধু-বান্ধব, তারপর ব্যক্তিগত এবং একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে। এক ধরনের ঘোর লাগা নিয়ে প্রায় প্রতিদিন চলে সে আলাপচারিতা। আমার যাবতীয় গোপনীয়তার রুদ্ধদ্বার একে একে খুলে যায় তোমার কাছে। তোমারও অনেক কিছুই গভীর ও গোপন জানা হয়ে যায় আমার। আমার তীব্র নারীপ্রীতির বিষয়টিও লুকোইনি তোমার কাছে। আমার সেক্স এডভেঞ্চারগুলোর নির্জলা বর্ণনাও দিয়েছি তোমাকে। টেলিফোনের অপর প্রান্তে তা শুনে তুমি কি শিহরিত হয়েছো? না, আমার প্রতি

ছুড়ে দিয়েছো নির্বাক ঘৃণা তার কিছুই জানি না। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, কেন সব অর্গল এভাবে খুলে দিয়েছি তোমার কাছে?

এভাবেই, আলাপচারিতার ধারাবাহিকতায় তোমাকে আমার ভালো লাগার বিষয়টিও জানাতে বাকি থাকেনি। ভালো লাগে তোমার কথা, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ভালো লাগে টেলিফোনের তারে ভেসে আসা রিনঝিন হাসি। তোমার আকর্ষণীয় ফিগার, জাপানি জর্জেটের আড়ালে থাকা তোমার পুষ্পিত শরীর কিংবা টান টান বুককে আগলে রাখা ব্রা–র আভাস কি তীব্রভাবে আমাকে আকর্ষণ করে তাও বলতে বাদ রাখিনি তোমাকে।

তুমি হেসেছো, বলছো, শুনতে ভালোই লাগে। এখনো আমি এতো আকর্ষণীয়!

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসা খিল খিল হাসি এ প্রান্তের আমাকে কিভাবে তরঙ্গায়িত করে, তা তুমি জানো না। চাকরির শত ব্যস্ততার মাঝেও তোমাকে টেলিফোন করি তোমার আগ্রহ, তোমার প্রশ্রয় আমাকে উদ্বেলিত করে, মোবাইল কিংবা টিঅ্যান্ডটি–র বিলের টাকা বাড়তে থাকে। কিন্তু তোমার চুম্বক আকর্ষণ আমাকে ছাড়ে না।

সে বছর মহেশখালিতে গিয়েছি। কক্সবাজার থেকে স্পিডবোটে তুমি, আমি ছাড়াও দলে আরো অনেকে। পাহাড়ের ওপর মহেশখালির আদিনাথের মন্দির। সেখানের উচ্ছ্বাস বাতাসে তোমার চুল ওড়ে যায়, ওড়না সরে যায় বুক থেকে। তুমি আর আমি পাশাপাশি, অন্যরা ঘুরছে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে। কি জানি কেন, উপুড় হতে গিয়ে পড়ে যায় তোমার সানগ্লাসটি একেবারেই আমার পায়ের কাছে। তুমি আর আমি এক সঙ্গেই সেটি তুলতে যাই। আমার হাতেই আসে আগে। সানগ্লাসটা তোমার হাতে তুলে দিতে গিয়েই হঠাৎ করে বলে ফেলি, আমি পরিয়ে দিই?

তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও, চোখের ভাষা বুঝে নাও। তারপর আশপাশে তাকিয়ে কেউ দেখছে না এটি নিশ্চিত হয়ে ঘাড় বাকিয়ে সম্মতি দাও।

আমি দুই হাতে তোমার চোখে সেটি পরিয়ে দিই। আমার করতল স্পর্শ করে তোমার পেলব কপোল। তোমার পেলব কপোলের প্রথম পরশ আমার শরীরে ছড়িয়ে দেয় বিদ্যুৎচ্ছটা। কয়েক ডজন নারী শরীরের অন্ধি–সন্ধি জানা আমাকে তোমার গালের সামান্য স্পর্শ এভাবে বিদ্যুতায়িত করতে পারে তা কখনো ভাবিনি আগে। *আমার চোখের ভাষায় কি তুমি দেখেছিলে তোমার সর্বনাশ ?* আমি বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এমন কিছু যা আগে কখনো বলিনি।

তুমি তা বুঝতে পারলে। বললে যাক, কি লাভ জীবনের কমপ্লিকেসি বাড়িয়ে? বন্ধু আছি, বন্ধু হয়েই থাকি না! তুমি আমার সামনে থেকে চলে গেলে, নাকি পালিয়ে গেলে?

তোমার চলে যাওয়ার রেশ না ফুরাতেই আমার চোখে ভেসে ওঠে *পৃটি ওম্যান* সিনেমার সেই দৃশ্য যেখানে নায়ক রিচার্ড গিয়ার–এর আপাত প্রত্যাখ্যানের পর প্রস্থানরত নায়িকার জুলিয়া রবার্টস–এর কপোল ভেসে যায় তরল ভালোবাসায় আর গাড়ির স্টিরিও থেকে ভেসে আসে –

It must have been love
But its over now
It must have been good
But I lost it somehow
From the moment we touched
Till the time had run-out.

আমিও কি এমনি ভালোবাসায় পড়েছি, তাও সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর? জানি না। শুধু জানি ভালোবাসার বোধহীন একজন মানুষকে ভালোবাসা বোধ দিয়েছো তুমি। একটি স্খলিত সানগ্লাসের আর তার সঙ্গে স্পর্শের

একটি সামান্য ঘটনা কি অসামান্যই না হয়ে উঠতে পারে একজনের জীবনে! রহস্যময়ী, অধরা, (না, প্রিয় বন্ধু আমার) তুমি কি তা জানো?

*আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা থেকে*

## রহস্য

– সামছুল হুদা সোহেল

অর্ধযুগ আগের ঘটনা। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাস। তখন শীতকাল। আমাদের গ্রামটি ছোট হলেও খুবই সুন্দর। আমার খুব ভালো লাগে, East and west, my village is the best. বাড়িতে যে কয়েকদিন অবস্থান করি, বেশির ভাগ সময়ই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই। বিশেষ করে আছর নামাজের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। আবার কোনোদিন এশা পর্যন্ত। কখনো কখনো আরো বেশি সময়। তুহিন, বাতেন, আকাশ, হান্নান, রতন, হাসান, উজ্জ্বল, ফারুক তাদের সঙ্গে। তারা আমার গ্রামের বন্ধু। বিভিন্ন বিষয় আমাদের আড্ডায় আলোচনা হয়।

আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে চক অর্থাৎ ফসলি ক্ষেত যেখানে কোনো বাড়িঘর এখনো গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে উভয় দিকেও ফসলি ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে সড়ক। ইদানীং সড়কটি পাকা হয়েছে। সড়কটি রাজধানীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। যদিও এখনো বাণিজ্যিকভাবে বাস চলাচল শুরু হয়নি। ধারণা করা যাচ্ছে, খুব শিগগির বাস চলাচল শুরু হবে।

প্রতিদিন বিকেলে আমরা যখন ঘুরে বেড়াই তখন আমাদের গান গেয়ে, গান শুনিয়ে আনন্দ দেয় হান্নান। হান্নান খুব ভালো গান গায়। মাঝে মধ্যে তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই। মনির খানের গাওয়া গানগুলো তার কণ্ঠে চমৎকার শোনায়।

বাড়িতে মেরুন কালারের চিকন একটি চশমার ফ্রেম ছিল। ফ্রেমটির ডান হাত (ডাট) ছিল না। শুধু ডান ডাট ছিল না তা নয়, গ্লাসও ছিল না। আমি ওই চশমাটি এক কানে লাগিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই ঘুরে বেড়াই প্রতি বিকেলে। কিন্তু তারা আমার চশমার রহস্য বুঝতে বা ধরতে পারে না।

অন্যান্য দিনের মতো এক বিকেলে আমরা অর্থাৎ হান্নান, বাতেন, রতন ও আকাশসহ হাটতে হাটতে দক্ষিণের চক দিয়ে আজিজপুর সড়কে যাই। সে সময় আমার নাক ও কানে ছিল কাচ এবং ডান হাতে ডাট ছাড়া ওই চশমাটি। ওই সড়কের পাশে একটি বরই গাছ ছিল। গাছে সুদৃশ্য বরই দেখে মনকে আর সামলাতে পারলাম না। হোক সেটি অন্যের গাছ। মালিক আশপাশে নেই তো কি হয়েছে? খেতে যখন মন সায় দিয়েছে তখন আর না খেয়ে ছাড়ছি না। খাবোই। বললাম আমি।

আমার সঙ্গে তারাও সুর মেলালো। গাছে না উঠেই, যদিও গাছটির আকৃতি বিশাল ঢিল ও ইটের টুকরোসহ হাতের কাছে যা পেলাম তাই ছুড়ে মারলাম। প্রত্যেকেই দুই একটি করে মারার ফলে বেশ কতোকগুলো বরই পড়লো। আমরা কুড়িয়ে নিয়ে খেতে শুরু করলাম।

এরই এক পর্যায়ে আকাশ হঠাৎ বলে উঠলো, সোহেল, তোমার চশমার ডান দিকের ডাট পড়ে গেছে।

সে সঙ্গে অন্যরাও বললো, ঠিকই তোমার ডাট পড়ে গেছে।

আমি তো ব্যাপারটি জানি। তবুও তাদের কথামতো ডান কানে হাত দিলাম তাদের বিশ্বাস করাতে। বাম হাত দিয়ে চশমাটি খুলে বন্ধুদের বললাম, ঠিকই তো। কোথায় পড়লো?

বন্ধুরা খুজতে লাগলো। উপরে–নিচে, ডানে–বামে, চারদিকে যাকে বলে গরু খোজা।

তাদেরকে চশমার ডাটের সন্ধানে ব্যস্ত দেখে আমি তো মনে মনে হাসছি। পাছে তারা জেনে না যায় আমার চশমার কাচ ডান পাশের ডান হাত ছাড়া অর্থাৎ ডাটটি আসলেই নেই। আমিও যে খুজছিলাম না, তা নয়।

বেশ কিছুক্ষণ গরু খোজা করে তারা যখন প্রায় ক্লান্ত তখন বললাম, দোস্তরা বাদ দাও, পাওয়া যাবে না। লাফ–ঝাপ দেয়ার ফলে কোথায় গিয়ে পড়েছে, কে জানে? এতো খুজেও যখন পেলাম না, থাক চলো, যাওয়া যাক।

তারা দুঃখ প্রকাশ করলো। আমার চশমার ডাটটির কোনো সন্ধান পেল না বলে। অতঃপর যে যার বাড়িতে। আজও তারা জানে না চশমাটির গোপন রহস্য। হয়তো কোনোদিন জানবেও না, যদি না লেখাটি প্রকাশের পর তাদের দৃষ্টিতে না পড়ে।

*নবাবগঞ্জ, ঢাকা থেকে*

# ভাঙার ইতিহাস

– তৃষা

ছোটবেলায় আপুদের দেখে ভাবতাম, ইশ! আপুরা কতো সুখী। কারণ তাদের চোখে চশমা আছে। ছোট আপুকে চশমা পরলে কি যে সুন্দর লাগতো! মাঝে মধ্যে আপুদের চশমা চেয়ে নিয়ে আমার চোখে দিতাম। আয়নায় দাড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবতাম, ইশ! কবে যে আমার এমন চশমা হবে!

আস্তে আস্তে বড় হলাম। চোখের সমস্যা দেখা দিল। ফলে চশমার প্রয়োজন হলো। আমার খুশি তখন দেখে কে? চশমা পরবো ভাবতেই খুব আনন্দ হতে লাগলো।

ভাইয়ার একমাত্র ছোট আদরের বোন হওয়ায় আমাকে বেশ দামি দেখে একটা চশমার ফ্রেম কিনে দিলেন। কিন্তু চশমা নিয়ে যে, আমার কপালে দুঃখ আছে তখন বুঝিনি। বুঝলে কি আর চশমা নিই?

আমার প্রথম চশমা ভাঙে আমার ভাগ্নের হাতে। এরপর ওকে ইচ্ছামতো বকুনি দেয়া হয়। এবং আমার চশমার নতুন করে গ্লাস লাগানো হয়। আমার চশমাটি রিমলেস ছিল বলে গ্লাস লাগানো গিয়েছিল।

আমার দ্বিতীয়বার চশমা ভাঙে লোডশেডিংয়ের সময়। আমি চার্জার জালিয়ে কেবল ঘর থেকে বের হবো হঠাৎ জামায় লেগে চশমা টেবিল থেকে পড়ে গেল এবং ভেঙে গেল।

তৃতীয়বার বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম। চোখে থেকে চশমা খুলে বিছানায় রেখেছিলাম। হঠাৎ পাশ ফিরতেই পিঠের নিচে চশমা পড়লো এবং ভেঙে গেল।

চতুর্থবার চুল আচড়াতে গিয়ে ওড়নায় বেধে ড্রেসিং টেবিল থেকে পড়ে যায়। এবং চশমা ভেঙে যায়।

ভয়ে আছি পঞ্চমবার কবে যে ভাঙে!

*ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# দরবেশ

– ডা. ফসিয়ার রহমান

শীত কেবল পড়তে শুরু করেছি। লেপ, কাথা, কম্বল অনেকেই বের করেনি। চমৎকার সূর্যালোক মাখা সকাল। সম্ভবত তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। কোনো এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবো। প্রতিযোগিতার নাম *যেমন খুশি তেমন সাজো।*

স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিনের স্মৃতি। মায়ের শাদা শাড়ি এবং পুরু পাওয়ারওয়ালা চশমা সংগ্রহে নিলাম।

মা বললেন, এসব নিয়ে করবি কি?

বললাম, দরবেশ সাজবো।

তা কি করে সম্ভব?

সম্ভব মা, তোমার ছেলের প্রয়োজন মোতাবেক উপকরণগুলো সংগ্রহ করে দাও।

আর কি লাগবে তোর?

পাটখড়ির গায়ে লেগে থাকা ফেশো।

সানন্দেই মা একে একে সবই ম্যানেজ করে দিলেন।

সেগুলো নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর সময় মতো সাজগোজ সেরে ফেললাম। পাট দিয়ে দাড়ি গোফ তৈরি হলো। পাঞ্জাবিটাও গায়ে পরেছি। বাড়তি কাপড় গুজে ভূড়িটা মোটা করলাম। সব শেষে চশমা পরলাম।

সে কি বিব্রতকর মুহূর্ত! পাওয়াওয়ালা চশমা পরে চোখে সব উচু-নিচু দেখছি। কোকড়া এবং রাঙানো লাঠি ভর করে তিন ঠ্যাঙে হাটার কৌশল। বেশ সুন্দর করে সেজে খেলার মাঠে যেই না গিয়েছি অমনি ভিড় জমলো কচিকাচাসহ বয়স্কদের।

কথা বললাম, অবিকল দাতহীন বুড়োর মতো।

বিচারকরা আমার ব্যাপারটায় অন্য রকম মজা পাচ্ছিলেন। তারা আমাকে মাইক্রোফোনে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন।

*হক মওলা* বলে চিৎকারে সব নিস্তব্ধ করতে পেরেছিলাম। আশানুরূপ ফল পেলাম। ফার্স্ট হয়ে সেই চশমা পরিহিত অবস্থায় মায়ের সামনে হাজির হলাম।

আশ্চর্যের আরেক পর্ব সেখানেও অপেক্ষা করছিল। খুব মজা হলো সে পর্বে। মা আমাকে চিনতে পারলেন না, বরং বুড়ো ফোকলা কণ্ঠের আওয়াজ শুনে তিনি মাথায় কাপড় ঠিক করতে ব্যতিব্যস্ত হলেন।

এক সময় কাছে গিয়ে চশমাখানি খুলে তার চোখে পরিয়ে দিলাম। বললাম, মা, আমি তোমার ছোট ছেলে ফসিয়ার।

মা অবিশ্বাস্য চাহনি রেখে পিঠে মৃদু চড় দিয়ে বললেন, ওরে পাগল ছেলে, এই বুঝি তোর দরবেশ সাজা।

বললাম, মা, আমি তোমার ওইগুলো দিয়ে সেজে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছি।

মা হাসলেন। আশীর্বাদ করে বললেন, তুই অনেক বড় হবি।

*ঝিকরগাছা, যশোর থেকে*

# অপ্রত্যাশিত

– হাসানুর রহমান

এখন চশমা পরা সুন্দরী মেয়ে দেখি যত্রতত্র। মনে কোনো কষ্ট পাই না। এক সময় চশমা পরা সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখলে বুক ভেঙে কান্না বেরিয়ে আসতো। ফিরে যেতাম সুদূর অতীতে। এই চশমাই আমার জীবনকে প্রায় ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল। আমার জীবনে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাটি ঠিক এমন :

তখন থাকতাম মাদারীপুর অফিসার্স কোয়ার্টারে। ক্লাস টেনের মেধাবী ছাত্র। জেলার নামকরা স্কুলের ফার্স্ট বয়। আমাদের বিল্ডিং-এর পাশের বিল্ডিংয়ে থাকতেন জনৈক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। তার ছিল দুই মেয়ে। বড়টি ক্লাস এইটে পড়তো আর ছোটটি ক্লাস থ্-তে। তারা ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। কারো সঙ্গে তেমন মিশতো না। অনেকটা রক্ষণশীল মনোভাবের। মেয়ে দুটি ছিল অপূর্ব সুন্দরী। বিশেষ করে বড় মেয়েটিকে মনে হতো জীবন্ত অগ্নিশিখা। পুরো কোয়ার্টারে ছেলেদের আলোচনার মূল উপজীব্য ছিল সে। আমাদের আর তাদের ফ্ল্যাট একই তলায় হওয়ার সুবাদে মাঝে মধ্যে তাকে দূর থেকে দেখতাম। দেখলেই বন্ধুদের মাঝে গল্প ছাড়তাম দোস্ত, আজ তাকে দেখেছি।

তাছাড়া সে বারান্দায় আসতো খুবই কম।

একদিন বারান্দায় বসে আছি। ছোট মেয়েটিও তাদের বারান্দায় এলো। আমি পকেট থেকে আমার চশমাটি বের করে পরলাম। উদ্দেশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হলো।

কিছুক্ষণ পরই মেয়েটি তার আম্মু কিংবা আব্বুর ইয়া বড় একটি চশমা পরে হাজির।

তাই দেখে আমি হা হা হা করে হেসে উঠলাম।

সে আমাকে ভেংচি কাটলো।

তার সাহস দেখে বিস্মিত হলাম। প্রত্যুত্তরে আমিও ভেংচি কাটলাম। ঠিক এমন সময় বড় ভাইয়া বারান্দায় চলে আসায় আমি বাসার ভেতরে চলে এলাম।

পরের দিন বারান্দায় বসে আছি।

মেয়েটি বারান্দায় এলো। আমাকে দেখেই দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে হাতে চশমা নিয়ে ফিরে এলো। চশমাটি চোখে দিয়ে এমন ভাব করলো যেন সে বিশাল কিছু করে ফেলেছে।

তার ব্যবহারে পুলক অনুভব করলাম। আমিও ভেতর থেকে চশমা নিয়ে বারান্দায় এলাম।

যখন চশমা পরে দাড়ালাম, সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো।

আমিও বেশ মজা পেলাম।

এরপর ব্যাপারটি প্রায় অভ্যাসে পরিণত হলো। আমি বারান্দায় এলেই সে দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। চশমা নিয়ে ফিরে আসে। চশমাটি চোখে দিয়ে চমৎকার ভঙ্গিমায় আমার দিকে তাকায়।

আমি পকেট থেকে চশমা বের করে পরি।

সে অদ্ভুত শব্দে হেসে ওঠে।

দেখতে দেখতে পূজার ছুটি চলে এলো। আমার স্কুল বন্ধ। তাদেরও স্কুল বন্ধ। একদিন বারান্দায় বসে আছি। ছোট মেয়েটি বারান্দায় এসেই দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

আমি ভাবলাম আগের মতোই বুঝি চশমা নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সে যা করলো তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সে তো চশমা আনলোই, সঙ্গে করে নিয়ে এলো বড় বোনকে।

বড় মেয়েটি বারান্দায় কালো চশমা পরিহিত আমাকে দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটটিও চলে গেল।বড় মেয়েটিকে দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হলো। শ্বাস বন্ধ করে কি ঘটছে তা দেখার জন্য দাড়িয়ে রইলাম।

দেখলাম ছোট মেয়েটি তার বড় বোনকে বারান্দায় আসার জন্য টানাটানি করছে। বড়টি যেন তাকে কি বলছে। এরপর ছোটটি একাই বারান্দায় এলো।

আমরা আগের মতোই অনেক দুষ্টামি করলাম। সেদিন মনে হয় একটু বেশিই করেছিলাম। লক্ষ্য করলাম, বড় মেয়েটি ভেতর থেকে সব কিছু খেয়াল করছে।

এরপর আমরা দুষ্টামি করতাম আর ভেতরে বসে সে তা দেখতো।

এখন আমি ছোটটির সঙ্গে দুষ্টামি করি ঠিকই কিন্তু মন পড়ে থাকে বড়টির কাছে। মূলত ছোট মেয়েটির সঙ্গে দুষ্টামি করলেও তারচেয়ে ভেতরে দাড়ানো বড় মেয়েটির অস্পষ্ট ছবি দেখার আগ্রহই আমার বেশি।

একদিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ছোট মেয়েটির হাতে আর মোটা ফ্রেমের সেই বড় চশমাটি নেই। বরং তার হাতে কতোকগুলো চমৎকার ছোট চশমা। চশমাগুলো দেখেই বুঝলাম এগুলো বড় মেয়েটির। কিন্তু এতোগুলো চশমা দিয়ে সে কি করে? অতএব চশমার প্রতি তার একটা আলাদা টান আছে। এটা স্পষ্ট। ছোট মেয়েটি এগুলো আমাকে দেখায় আর হাসে। ভাবখানা এমন আমার এতোগুলো আছে, তোমার নেই।

আমি মুখে ভেংচি কাটি। মনে মনে বলি বেশ মজা তো!

এরই মাঝে ছুটি শেষ হয়ে গেল। আবার স্কুল খুললো। কিন্তু কিছুতেই পড়াশোনায় মন বসাতে পারছিলাম না। পর্দার আড়ালে দাড়ানো আবছা মূর্তিটিকে বার বার মনে পড়তে লাগলো। মনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে

অবশেষে পরাজিত হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম স্কুলের গেটে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো। এমন রক্ষণশীল ঘরের মেয়ে যদি বাসায় বলে দেয়! এই ভয়ও কাজ করছিল।

স্কুলের গেটে গিয়ে দাড়িয়ে রইলাম।

ছুটি হলে সে বাইরে এলো। আমাকে দাড়ানো দেখে অবাক হলো। মুচকি হেসে বাসায় চলে গেল।

তার আচরণে মনে সাহস পেলাম। এভাবে কয়েক দিন স্কুল গেটে দাড়িয়ে থেকে তাকে দেখলাম। আমার অস্থিরতা বাড়লো। সিদ্ধান্ত নিলাম তার সঙ্গে কথা বলবো। কিন্তু কি বলবো, কিভাবে বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। অনেক সাহস সঞ্চয় করে সেদিন বাসা থেকে বের হলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ কথা বলবোই।

তার সামনে গিয়ে দাড়ালাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, চশমা কি তোমার খুব ভালো লাগে?

দ্বিগুণ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম সে বলছে, হ্যা ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে।

সেদিন বাসায় ফিরে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। বার বার কানের কাছে তার কথাগুলো বাজতে লাগলো। সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না।

এরপর প্রায়ই টুকটাক কথা হতো। একদিন তাকে বললাম, আমি তোমাকে একটি চশমা উপহার দিলে তুমি কি সেটা নেবে?

সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

তার সম্মতিতে আমার যে সুখানুভূতি হয়েছিল তা শুধু অনুভবই করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। বিশ্ব জয়ের আনন্দও মনে হয় এর কাছে তুচ্ছ। সিদ্ধান্ত নিলাম চশমা উপহার দেয়ার সময় তাকে মনের একান্ত কথাটি বলবো। অবশ্য আগেই আমরা পরস্পরকে বুঝে ফেলেছিলাম।

সেদিনই স্থানীয় পুরনো বাজার মার্কেটে গিয়ে *ফ্যাশন অপটিকস* থেকে সবচেয়ে দামি চশমাটি কিনলাম। আমার এক বন্ধুর বোনের মুখের মাপ নিয়েছিলাম।

পরদিন স্কুলের গেটে গিয়ে দাড়ালাম। হাতে গিফট বক্স। সে বের হলো। মনে হলো রাজ্যের চিন্তা তার ক্ষুদ্র চেহারাটিতে ভর করছে। আমাকে দেখে তেমন কোনো উৎসাহ দেখালো না। তার সামনে গেলাম। গিফট বক্সটি বাড়িয়ে ধরলাম।

সে নিল। উজ্জ্বল চেহারায় একবার আমার দিকে তাকালো। কিছু না বলেই চলে গেল।

কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিস্ময়ে বোবা হয়ে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনকে কিছুতেই স্থির করতে পারছিলাম না।

বাসায় ফিরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। জীবনকে অর্থহীন মনে হলো। কেউ কি আমাদের কথা বলতে দেখেছো? তার আব্বুকে বলে দিয়েছে? এমন নানান প্রশ্ন মনকে অস্থির করে তুললো।

অস্থিরতা দূর করার জন্য স্থানীয় দৈনিকে চোখ বোলাতেই পেয়ে যাই সব প্রশ্নের উত্তর। প্রথম পৃষ্ঠাতে বেশ বড় করেই লেখা দুর্নীতির দায়ে অমুক সাহেব সাময়িকভাবে বরখাস্ত। বিস্তারিত পড়তে মন চাইলো না।

সকালে শুনি তাদের বাসা তালা মারা। উপর মহলে তার বাবার লোক ছিল। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বদলির ব্যবস্থা করে তিনি রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়ে চলে যান। কিন্তু আমার অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে যান তিনি। আমার মেধাক্রম প্রথম থেকে চলে যায় দ্বাদশতমে।

সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম কিভাবে *আমও যায়, ছালাও যায়*। আর মজার ব্যাপার হলো, আজও আমি একা।

*ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে*

# মাস দেড়েক

– রফিকুল ইসলাম

তখন সবেমাত্র এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে উঠেছি। *ফার্স্ট ইয়ার ডোন্ট কেয়ার* এই মন্ত্রের কারণে কি না জানি না, আমার জুটে যায় বেশ কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবী। ইফতি, সরোয়ার, নিভা, জাকিয়া, নিপু, শুভ এবং জিমিকে নিয়ে এক একটা দিন স্বপ্নের মতো কাটছিল। নিজেকে মনে হতো যেন পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত ও সুখী মানুষ। ঠিক সে সময় আমাদের ছেলেদের মধ্যে কেমন একটা যেন পরিবর্তন আসা শুরু করে।

ছেলে বন্ধুরা বলতো, যতো মুড দেখাবি ততো মেয়েদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

যে বন্ধুকে স্কুলে থাকতে যা খুশি বলতে পারতাম সেই বন্ধুকেই কলেজে খুব সাবধানে কথা বলতে হতো। বেখেয়ালের বশবর্তী হওয়ায় এক বন্ধুর কাছে এ জন্য একদিন বেশ শুনতে হয়েছিল।

যাহোক, আমাদের যখন এমন অবস্থা সেই সময় আমাদের উপলব্ধি হলো, ছেলেরা চশমা পরলে তাদেরকে আরেকটু সিনিয়র ও আকর্ষণীয় মনে হয়। বিশেষ করে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থাকার জন্য সকলেই মরিয়া হয়ে উঠলাম চশমার জন্য। বাড়ি থেকে কিভাবে চশমার টাকা হাতানো যায় সেই পরামর্শ দিতে এগিয়ে এলো নাটের গুরু সরোয়ার।

আমার সকল অপকর্মের (!) সঙ্গী সরোয়ার বললো বাসায় চোখের সমস্যার কথা বলতে।

বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে সোজা চশমার দোকানে। কার্বন ফ্রেমের কালো গ্লাসের চশমাটা বোধ হয় সেই সময়ের জন্য বেশি ভারী হয়েছিল।

আমার সরল মা, ছেলের চোখে চশমা দেখেই বোধহয় তুষ্ট হয়েছিলেন। পরে কখনো এ নিয়ে আমাকে উকিল জেরায় জর্জরিত করেননি ডাক্তারের প্রেসকৃপশন দেখানোর জন্য।

তবে গোল বাধালো চশমার কালো কাচ, পরলে আবছা আলোতে কিছুই দেখি না। তারপর নতুন নতুন চশমা পরার যন্ত্রণা।

শুরু হলো অন্যদের টিকা–টিপ্পনি কাটা, কিরে, অন্ধ হাফিজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র কই যায়? ময়লা কাপড় ও খোচা দাড়িতে তো আবার সানগ্লাস পরা যায় না মেয়েদের সামনে। হায়রে, সে সময় খোচা দাড়ির ঋত্বিক রোশান আসেনি। তাহলে আমাকে আর রোজ রোজ দাড়ি কাটতে হতো না।

বড়জোর মাস দেড়েক। তারপর রণে ভঙ্গ দিলাম। সেই যে চশমা ছাড়লাম, আজ ২৮ বছর বয়স হতে চললো, চশমা পরা আর হয়নি। কেন চশমা এখন পরি না? কোনো প্রয়োজন বোধ করি না, তাই। তবে সেই আনন্দঘন বিশেষ সময়ের চশমা নিয়ে কেলেংকারি (!) আজও হাসির খোরাক যোগায়।

*রাজবাড়ি থেকে*

# শেষ বান্ধব

– এম.এ মালেক

আল্লাহর এই দুনিয়ার সৌন্দর্য সুধা ভোগ করার জন্য দৃষ্টিশক্তি দরকার। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে। তখনই দরকার চশমার। প্রয়োজনীয় সঙ্গী হিসেবে চশমা অপরিহার্য। শ্রবণ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ ও কথনের ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হয়ে সবল বা বৃদ্ধি করার যন্ত্র যথা কানের জন্য ইয়ার ফোন, চোখের জন্য চশমা, কথার জন্য মেগাফোন আবিষ্কার হলেও ঘ্রাণের জন্য বিজ্ঞান এখনো কার্যকরী কিছু আবিষ্কার করেনি। বয়সকালে এখন ফুলের গন্ধ পাই না। আফসোস!

এই জগৎ সংসারে মানুষের যতো কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু আছে এর মধ্যে অন্যতম হলো চশমা। কোনো কারণে এটি হারিয়ে বা ভেঙে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে জোগাড় করা কষ্টকর ও সময়ের ব্যাপার হলেও সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। না হলে বেশি পাওয়ারের চশমা ব্যবহারকারীকে নানানমুখী অসুবিধায় পড়তে হয়।

কম বয়সী ছেলেমেয়েদের চোখের রোগের জন্য ডাক্তারের পরামর্শে পাওয়ারফুল চশমা পরতে হয় বটে কিন্তু বাহ্যিকভাবে দেখতে কেমন যেন বেমানান লাগে। কলেজ ও ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদেরকে পাওয়ারের চশমা পরলে কেমন যেন বয়সী বয়সী মনে হয়। তবে পিকনিক অথবা কোনো ফাংশনে কালো গগলস পরলে চেহারায় সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। পঞ্চাশঊর্ধ পুরুষ–মহিলাদেরকে পাওয়ার চশমা পরলে বেশ সুন্দরও লাগে। বয়সী লোকের গগলস তেমনটা ভালো দেখায় না। সাধারণত যৌবনকালে প্রেমিক–প্রেমিকারা একে অপরের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ নিমিত্তে কালো গগলস চশমা ব্যবহার করে, চেহারা সৌন্দর্য ও স্মার্টনেস বৃদ্ধি করার প্রয়াসে ব্যবহার করে। ট্যারা চোখের দোষ ঢাকার জন্য এবং চুরি করে সৌন্দর্য দেখার জন্য কালো চশমার ব্যবহার হয়ে থাকে। নিরীহ গরুকে ক্লান্তিহীন ঘুরে ঘানি টানার জন্য গরুর চোখে ঠুলি পরানো হয়। বৃদ্ধ বয়সে চোখে ছানি পরলে অবশ্যই অপারেশন করতে হয় যা আমার বৃদ্ধ পিতাকে দুবার ঢাকায় এনে অপারেশন করতে হয়েছে এবং পরে তাকে বেশি পাওয়ারের চশমাও ব্যবহার করতে হয়েছে। পাওয়ার বেশি বলে চশমা ছাড়া অনেকে চলাফেরা ও কোনো কাজকর্মই করতে পারে না। তাই দুই দুটি চশমা রাখার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

চশমার ফ্রেমের ব্যাপারে একেক জনের পছন্দ একেক রকম। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিরা মোটা ফ্রেমের চশমা পরতে ভালোবাসেন। যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, অভিনেতা আবদুল্লাহ আল মামুন এবং আরো অনেকে। বাইফোকাল চশমা পরার বিড়ম্বনা অনেক। সিড়ি ভাঙা যায় না। উচু–নিচুতে হোচট খাওয়ার ভয়ে পকেটে রাখতে হয়। কাজেই বাইফোকাল পাওয়ারের চশমাধারীদের চশমা প্রায়ই হারিয়ে যায়। আমারও হারায়। প্রায়ই পাচ ছয়বার হারিয়েছি। তাই এখন থেকে বিড়ম্বনা থেকে বাচতে দুটি চশমা রাখি। বাসায় একটি এবং সঙ্গে অন্যটি। অনেকে চশমা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে চেইন অথবা কালো কাইতনের মাধ্যমে গলায় ঝুলিয়ে রাখে। আমিও চেষ্টা করেছি। কিন্তু বেখাপ্পা, দৃষ্টিকটু, অশোভন ও অসুন্দর লাগে বলে আর করিনি। এক সময় এটা ফ্যাশন ছিল। ডাকসাইটে উকিলদের মোটা ফ্রেমের পুরু কাচের চশমার ভেতর দিয়ে বড় চোখ করে থাকলে দারুণ লাগে। পারসোনালিটি বৃদ্ধি পায়।

ওয়ার্ল্ড রেসলিংয়ের দি রক এবং দি আন্ডারটেইকার রিংগে আসার সময় কালো দামি গগলস ব্যবহার করেন হয়তো বা তাদের চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। অনেক কৃকেটারই রোদের তাপ থেকে চোখকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে কৃম কালারের এক রকম সানগ্লাস ব্যবহার করেন। ব্যতিক্রম দেখতে পেলাম সম্প্রতি ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলায়। সেখানে ইংল্যান্ডের বোলার জাইলর্স একদম বেগুনি রঙের সানগ্লাস পরে বল করে দুই দুটি উইকেট নিয়েছেন।

চশমা নিয়ে আমার জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা আছে। ১৯৮৮ সালে বিশেষ কারণে গ্রামের বাড়িতে কোরবানির ঈদ করতে গেলাম। সঙ্গে স্ত্রী ও ছেলে সাহেদ। প্রায় ৯০ বছর বয়সের দাদি তখনো বেচে আছেন। দাদিকে সালাম করলাম।

মা বললেন, আম্মাজান, ঢাকা থেকে মালেক এসেছে।

দাদি অনেকক্ষণ আমার দিকে পলকহীনভাবে চেয়ে রইলেন।

মা বললেন, এটা হলো আপনার নাতি মালেকের দুষ্ট ছেলে নাতির ঘরের পুতি সাহেদ।

দাদি নড়েচড়ে বসে আমার ছেলেটার দিকে মাথা এদিক–ওদিক করে দেখতে চেষ্টা করেন। সুবিধা করতে না পেরে বললেন, বালিশের তলা থেকে আমার চশমাটা দাও। আস্তে আস্তে পুনরায় বললেন, নাতির ঘরের

পুতিকে একটু ভালো করে দেখি। চশমাটা চোখে দিয়ে দাদি বললেন, কি গো বৌমা, আমার নাতির ঘরের পুতিকে এতোটা হালকা ও ঝাপসা দেখছি কেন?

বললাম, না দাদি–সাহেদ তো খুবই মোটাসোটা ও নাদুস–নুদুস।

দাদি আস্তে আস্তে চশমাটা খুলে বলতে লাগলেন, আমার বড় বান্ধব তোর দাদাও নেই। ছিল এই শেষ বান্ধব চশমাটা। সেও তো আর পারছে না। গ্লাসের পাওয়ারও শেষসীমায়, আমিও শেষ। আর কতো! এই পোড়া চোখে কতো কিছু দেখলাম। তবে কোরআন পড়ার জন্য চশমাটা রাখি। বদলানো দরকার। যাক সবই কপাল!

ঠিক এই সময় আমার দুষ্ট ছেলে সাহেদটা ওই চশমাকে অতর্কিতে ছো মেরে হাতে নিয়ে জোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দেয়ায় চশমার গ্লাস দুটো ভেঙে গেল।

আমরা সবাই হতবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! একটা আনন্দঘন পরিবেশে চশমা এভাবে ভেঙে যাবে! আমরা বুঝে ওঠার আগেই ঘটনাটি ঘটে গেল।

আমার দাদি একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তাকে কেউ কিছু বলো না। তার কি আর দোষ? আমারই সময় ফুরিয়ে এসেছে। কাজেই মনে হয় শেষ বান্ধবেরও বিদায়।

প্রেসকৃপশনের কাগজটি অনেক খোজাখুজির পরও তখন পাওয়া যায়নি বিধায় দাদিকে ঈদের ছুটিতে নতুন চশমা দেয়া যায়নি। কেন যেন দাদিও আর তেমন আগ্রহ করেননি। দুঃখের বিষয়, ঈদের পরে মাসের মাঝামাঝি এক জুম্মার দিন বিকেলে আমার পরহেজগার দাদিটি পরলোকগমন করেন। টেলিফোনে খবর পেয়ে ত্বরিত শুধু আমিই গেলাম।

দাফন–কাফনের পর সবাই দাদি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলাবলি করছে।

কে যেন হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে একটু আক্ষেপের সুরে বললেন, সবই ঠিক আছে। কিন্তু মৃত্যুর এক মাস আগ পর্যন্ত বুড়ি মানুষটা একটা চশমার জন্য খুবই কষ্ট করে গেলেন। কেউ চশমা জোগাড় করে দিল না।

সবাইকে দেখলাম আমার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মনে হলো সবাই যেন মনে মনে বলছে, সব দোষ আমারই। স্মৃতিপটে চশমা ভাঙার ঘটনা উদয় হতে লাগলো। ঈদের দুদিন আগের ঘটনা। তাই কোরবানির গরু কেনা নিয়ে হাটে দুদিন যাওয়া আসা করলাম। কিন্তু গরু কেনা হলো না। ঈদের আগের দিন গরু কেনা হলো। এবং উক্ত দুদিনই ভাইদেরকে নিয়ে এজমালি সহায় সম্পত্তি ভাগ–ভাটোয়ারা নিয়ে মত বিরোধের কারণে দুটি মিটিং করতে হয়েছে। ফলে ব্যস্ত ছিলাম। সময়ও হাতে ছিল না। তারপর ঈদের পরের দিনই ঢাকায় চলে আসতে হয়েছিল।

মনে করেছিলাম, পরিবারের অন্য কেউ না কেউ এগিয়ে এসে দাদির চশমার সমস্যাটা ঈদের আগেই মিটিংয়ে ফেলবে অথবা পরে। কিন্তু কেউই করেনি। আমিও ততোটা খেয়াল করিনি। আমার অবশ্যই উচিত ছিল। দাদি অথবা আম্মার হাতে পাচশ টাকা দিয়ে যদি বলতাম, এখনই দাদিকে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে নতুন পাওয়ারের চশমা নিয়ে আসা হোক। অবশ্য হাতে তখন বাড়তি টাকাও ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে তা করিনি বলেই আমার শ্রদ্ধেয় দাদিমা মৃত্যুর এক মাস আগ পর্যন্ত চশমা বিহীন এবং কোরআন পড়া বিহীন জীবন কাটিয়ে গেছেন।

বাড়ির সবারই মনের কথা হলো, চশমা ভেঙেছে মালেকের ছেলে, অন্য কেউ কেন নতুন চশমার খরচ বহন করবে?

মনে হলো আমি যেন বিরাট একটা অন্যায় করে ফেলেছি। ইচ্ছা করেই দাদির কুলখানিতে পর্যন্ত থাকিনি। ছুটি না পাওয়ার অজুহাতে মনের দুঃখ চেপে পরের দিনই চলে এলাম। সেই সময় মনে একটা নীরব অপরাধ বোধ জেগে ওঠে।

আমার একটি বেখেয়াল, অবহেলায় ও অর্থসম্পদের অভাবে অতি আপনজন আমারই জন্য অপরিসীম কষ্ট পেয়েছিলেন বলেই একটা বাস্তব সত্য উপলব্ধি করলাম, নিরুপায় আপনজনদের অতি বান্ধব চশমা হারিয়ে অথবা কোনো কারণে ভেঙে গেলে যে কোনোভাবেই হোক, নতুন একটির ব্যবস্থা তখন তখনই করা উচিত। না হলে সময় গেলে আর ফেরে না। ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের কাছে তার চশমা বন্ধুর চেয়েও আপন।

*বাসাবো, ঢাকা থেকে*